আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন -'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি ।'

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

Self Employment and Enterpreneurship

দশম শ্রেণি

লেখক

প্রকৌ: ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
এম এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট (মেকানিক্যাল)
অধ্যক্ষ
মানিকগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

সম্পাদক

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর,২০১৬

পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৭

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ক্যারিয়ার গাইডেন্স সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	১–৭
দ্বিতীয়	জীবিকা ও কর্মজগৎ (World of Work) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	৮–১৫
তৃতীয়	আত্মকর্মসংস্থান	১৬–২৬
চতুর্থ	প্রেষণা ও পেশা নির্বাচন	২৭–৩৫
পঞ্চম	ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি	৩৬–৫১
ষষ্ঠ	ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা	৫২–৬৪
সপ্তম	লেনদেন ও হিসাবরক্ষণ	৬৫–৭৮
অষ্টম	সফল উদ্যোক্তা ঘটনা বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন	৭৯–৮৪
নবম	উৎপাদনশীলতার ধারণা	৮৫–৯২

প্রথম অধ্যায়

ক্যারিয়ার গাইডেন্স সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

Fundamental Concept of Carrier Guidance

ভূমিকা

ক্যারিয়ার গাইডেন্স' হচ্ছে এমন বিশেষ ধরণের সহায়ক কার্যক্রম যার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বা ব্যক্তি তাঁর স্বীয় মেধা (Talent), ঝোঁক (Aptitude), সামর্থ (Strength), যোগ্যতা (Qualification) ও পেশাগত দক্ষতার (Professional Expertise) সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে শিখবে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি ব্যক্তিমাত্রই নিজস্ব মেধা, ঝোঁক, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার অধিকারী। স্বীয় প্রতিভাকে জানতে পারা এবং নিজস্ব সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারা প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে সাফল্য লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন। ক্যারিয়ার গাইডেন্স একটি কার্যকর ও সহায়ক মাধ্যম হিসেবে বিশ্বব্যাপী গন্য হয়ে আসছে। আধুনিক বিশ্বে ক্যারিয়ার গাইডেন্স কার্যক্রমকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের জীবনগঠন এবং সাফল্য অর্জনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গন্য করা হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভোকেশনাল শিক্ষার্থীদের উন্নত জীবন গঠন এবং সাফল্য লাভের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স একান্ত প্রয়োজন।

১.১ ভোকেশন/বৃত্তি/পেশা বিষয়ক মৌলিক ধারণা

' Vocation' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ `Vocare' বা **'Vocationem'** হতে উদ্ভূত যার অর্থ আহবান করা (To Call)। পঞ্চদশ শতকে সর্বপ্রথম 'ভোকেশনাল' শব্দটি ধর্মবিশ্বাসে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বিশ্বে 'ভোকেশন' বা 'ভোকেশনাল' শব্দটি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পেশা এবং কর্মজগতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'ভোকেশন' শব্দটির সমার্থক শব্দ হচ্ছে পেশা, জীবিকা, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ব্যবসা প্রভৃতি। বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করা প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত কাজ। মানুষমাত্রই তার স্বীয় যোগ্যতা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করতে চায়। অতএব, জীবিকা অর্জনের জন্য যে অবলম্বন গ্রহণ করা হয় তাকে 'ভোকেশন' বা 'বৃত্তি' বা 'পেশা' বলে। অন্য কথায় নিজের জীবিকা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার পেশাকে ভোকেশন বা বৃত্তি বলে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে। যার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব পেশাভিত্তিক দক্ষ কর্মী তৈরী করা এবং প্রশিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পেশা হচ্ছে, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, সুয়িং মেশিন অপারেটর, রেডিও টিভি মেকানিক্স, পাইপ ফিটার, ম্যাশন, ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স, জেনারেল মেকানিক্স, মেশিনিস্ট ইত্যাদি।

ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার মুল উদ্দেশ্য হলো স্বীয় জ্ঞান ও দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করে কর্মজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। এজন্য প্রয়োজন একজন শিক্ষার্থীকে তাঁর স্বীয় মেধা, ঝোঁক এবং সামর্থ সম্পর্কে সচেতন করা, স্বীয় জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কীভাবে কর্মজগতে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করবে সে সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা, কর্মজগতের দক্ষতা ও চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিজের ক্যারিয়ার কীভাবে গড়ে তুলবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা। এজন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স তথা ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রধান এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ৪টি উপাদান রয়েছে।

১: নিজকে জানা

২। কর্মজগতকে জানা

৩। বিকল্প পেশা ও জীবিকা সম্পর্কে জানা (Undestanding Career Alternative)

৪।ক্যারিয়ার গঠনের পরিকল্পনা জানা

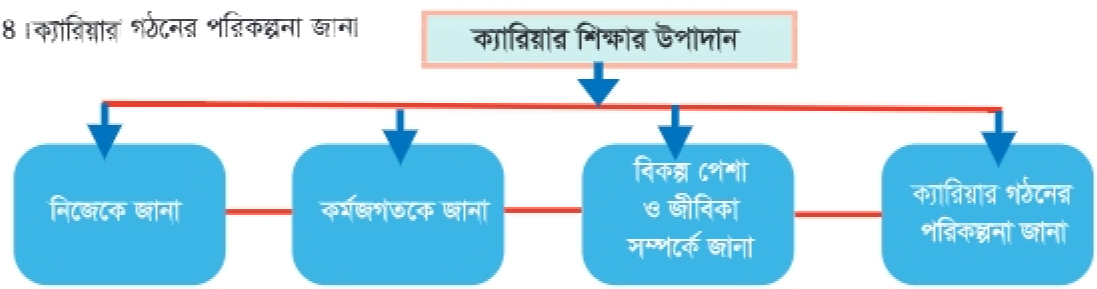

চিত্র-০১:ক্যারিয়ার শিক্ষার উপাদানসমূহের রেখাচিত্র

অর্থাৎ ক্যারিয়ার শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রথমত নিজের সামর্থ, ঝোঁক প্রবনতা, দূর্বলতা, সুযোগ-সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হবে। অর্থাৎ সে নিজকে জানবে, নিজের লুকায়িত প্রতিভাকে উন্মোচনের চেষ্টা করবে, নিজের ভবিষৎ জীবনের সম্ভাবনাকে জানার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত একজন শিক্ষার্থী কর্মজগতকে জানবে, অর্থাৎ কর্মজগতের সাথে নিজকে পরিচিত করবে। কর্মজগতের যে সব নতুন নতুন দক্ষতার উদ্ভব হচ্ছে তা জানবে এবং নিজকে কর্মজগতের পরিবর্তনের সাথে হালনাগাদ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। তৃতীয়ত কর্মজগতে যেসব নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত হবে এবং নিজের সম্ভাব্য পেশা সম্পর্কে আগাম সচেতনতা সৃষ্টি হবে। নিজের সম্ভাব্য ক্যারিয়ার গঠনের একটি স্বপ্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হবে। সামগ্রিকভাবে ক্যারিয়ার শিক্ষা নিজের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা থেকে শুরু করে ভবিষৎ ক্যারিয়ার গঠনের কাজকে সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করবে। সেজন্য ক্যারিয়ার শিক্ষাকে স্বপ্নের ক্যারিরার গঠনের প্রধান ও কার্যকর অবলম্বন হিসেবে গণ্য করা হয়।

ব্যবহারিক কাজ

তোমার ব্যক্তিগত তথ্য (Personal Information), সামর্থ (Strength), ঝোঁক প্রবনতা (Aptitude) এবং ভবিষৎ স্বপ্নের ক্যারিয়ার (Dream Career) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এমন একটি জীবন বৃত্তান্ত তৈরি করো।

১.৪ স্বপ্নের ক্যারিয়ার রূপরেখা প্রস্তুতকরণ

ক্যারিয়ারের রূপরেখা বা মডেল : মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড সুপার সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তনের ভিত্তিতে একটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন। এটিকে রংধনু জীবন (Life Rainbow) বলা যায়, কারণ এর ধাপগুলোকে রংধনুর মতো ধাপে ধাপে সাজানো যায়।

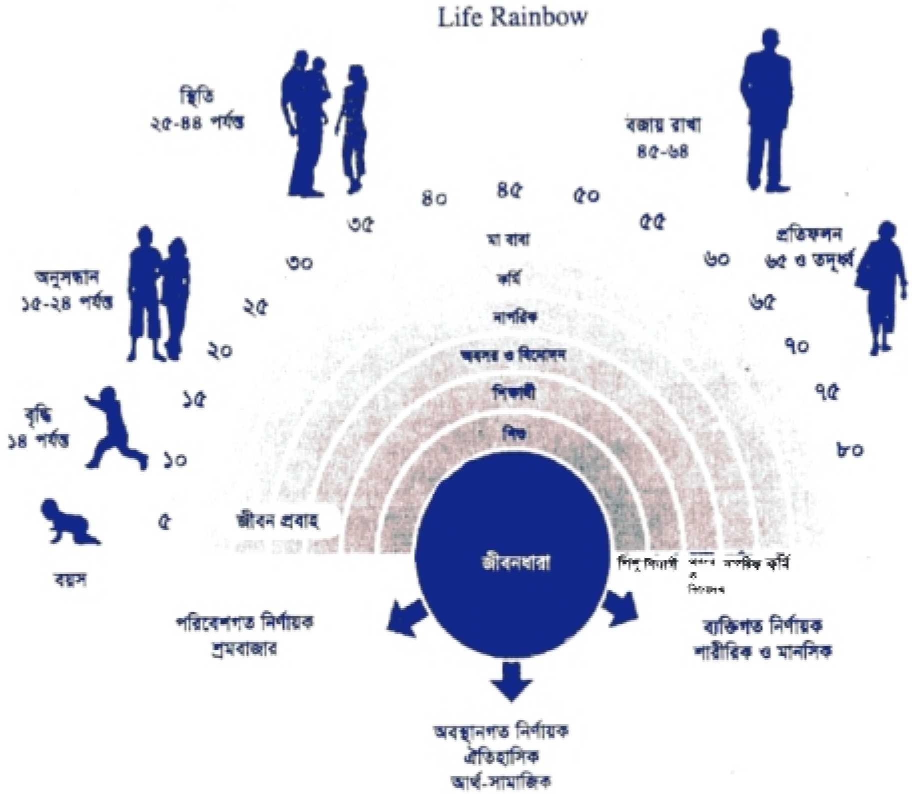

চিত্রঃ ০২: রংধনু জীবন

ধাপ	বৈশিষ্ট্য
প্রথম ধাপ : বৃদ্ধি	নিজের সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় ; দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা এবং কাজের একটি সাধারণ জগৎ সম্পর্কে ধারণা হয়।
দ্বিতীয় ধাপ : অনুসন্ধান	বিভিন্ন কাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা। পরিবর্তনশীল পছন্দ ও দক্ষতার গঠন।
তৃতীয় ধাপ : স্থিতি	কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে স্থায়ী অবস্থানে পৌছানো।
চতুর্থ ধাপ : বজায় রাখা	নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য ক্রমাগত পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা, মানিয়ে চলা, খাপ খাওয়ানো।
পঞ্চম ধাপ : প্রতিফলন	ফলাফল কর্মস্পৃহা কমে আসা, অবসর গ্রহণের প্রস্তুতি।

যদিও ডোনাল্ড সুপার তার পর্যায় বা ধাপগুলোকে বয়স অনুযায়ী ভাগ করেছেন, তবে এই ধাপগুলো ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন হতে পারে।

১.৫ স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ

আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি বা নির্দিষ্ট চাকরিতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখি। এরূপ স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিই। এক্ষেত্রে আমার কোন কোন দক্ষতা কতটুকু আছে তা নির্ধারণপূর্বক নিম্নের ছকটি পূর্ণ করি।

স্বপ্নের পেশা	যোগ্যতা ও দক্ষতা	কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রয়োজন	কতটুকু অর্জন করেছি	আর কী কী অর্জন করা প্রয়োজন
স্বপ্নের পেশা-১	জাতীয় দক্ষতামান-১	জাতীয় দক্ষতামান-১	জাতীয় দক্ষতামান-১	জাতীয় দক্ষতামান-৩
	জাতীয় দক্ষতামান-২	জাতীয় দক্ষতামান-২	জাতীয় দক্ষতামান-২	
	জাতীয় দক্ষতামান-৩	জাতীয় দক্ষতামান-৩		
স্বপ্নের পেশা-২				
স্বপ্নের পেশা-৩				

টেবিল-১

এবার চিহ্নিত যে যে বিষয়ে আমার আরও যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করতে হবে, সেগুলো কীভাবে করতে পারি তা নিয়ে চিন্তা করি।

এক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় চিন্তা করে দেখি:

- আমি কি সঠিক পথে এগোচ্ছি? আমার যে ধারায় পড়া শেখার কথা, যা যা এর মধ্যে শেখার কথা তা কি পড়তে শিখতে পারছি ?
- পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি?
- কী ধরনের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারি যা আমাকে অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করবে?
- আমার পড়ার অভ্যাসে কি কোনো পরিবর্তন আনা প্রয়োজন? সেগুলো কী ধরনের পরিবর্তন?

যোগ্যতা ও দক্ষতা

এসো দেখি এমন কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা যা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য শর্ত হিসেবে দেখা যায়-

লেখার মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন	তাড়না, প্রেরণা, সক্রিয়তা
মৌখিক যোগাযোগ	নমনীয়তা
দলে কাজের যোগ্যতা	পেশাদারী মনোভাব
আত্মসচেতনতা	ব্যবসায়িক সচেতনতা
সংখ্যা জ্ঞান বা গাণিতিক দক্ষতা	হিসাব-নিকাশ
সমস্যা সমাধান বা অনুসন্ধান বিশ্লেষণ	পরিকল্পনা ও সংগঠিত করা
নেতৃত্ব	সময়নিষ্ঠা

টেবিল-২

এসো দেখি এ যোগ্যতাগুলোর কতটুকু আমার আছে, কোথায় আমার ঘাটতি আছে, আমার সুযোগগুলো কী কী এবং কোন বিষয়টিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) Analysis এর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি।

আমার শক্তি	আমার দুর্বলতা
আমি দলের মধ্যে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারি	উপস্থাপনা আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়
আমি আমার লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী	আমি খুব সূক্ষ্ম ব্যাপারে মনোযোগী নই
ভবিষ্যতে আমি যে চাকরি করতে চাই তার বাজার খুব ভালো	আমার পছন্দের চাকরির বাজারে অনেক যোগ্য প্রার্থী রয়েছে

টেবিল-৩

উপরোক্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ পূর্বক তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।

সমাধানের উপায় নির্ধারণ

আমাদের জীবনে সব সময়ই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধান করতে হয়। যে যত পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম সে তত সাফল্যের দেখা পায়।

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে যে কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত।

- তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
- অনুমিত বিষয় পরীক্ষা বা যাচাই করা
- সমস্যাকে চিহ্নিত এবং এর পেছনের কারণ খুঁজে বের করা
- সৃজনশীল, উদ্ভাবনী আর কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করা
- সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পন্থা কাজে লাগানো
- বিকল্প পরিকল্পনা রাখা, বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পন্থা নির্ধারণ ও তার মূল্যায়ন করা
- বিভিন্ন গাণিতিক জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা
- জটিল সমস্যা সমাধানে ভোক্তা বা সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উৎকণ্ঠাকে নজর দেওয়া।

২০২৪

সময় গতিশীল। সময়ের এই গতিময়তার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপাশ, কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট। আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ কিংবা কৃষিভিত্তিক শিল্পে শ্রম দেওয়া। আজ বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। আজকের দিনে আমাদের দেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কী কী ধরনের কাজের সুযোগ আছে, কোন কোন পেশা গ্রহণ করা সম্ভব তা এই পাঠ থেকে আমরা জেনে নেব। পাশাপাশি, আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়েও জানার চেষ্টা করব। কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে গভীরভাবে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই আমাদের স্বপ্ন ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে পারব।

১.৬ নিজের মৌলিক পরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুতকরণ

- নাম
- লিঙ্গ
- জন্মকাল ও জন্মস্থান
- শিক্ষাজীবন
- ব্যক্তিগত জীবন
- অবসর জীবন (যদি থাকে)
- ক্যারিয়ারে কী কী বিষয় সফলভাবে পার করেছেন?
- কী কী বিষয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন? তা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছেন?
- এমন কোনো সিদ্ধান্ত যা হয়তো অন্য রকম হলে ভালো হতো মনে করেন?
- জীবনের অন্য কোন কোন বিষয় ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে?
- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা

ব্যবহারিক কাজ :

১। স্বপ্নের পেশা নির্ধারণে সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে ছক তৈরী করো।
২। নিজের জীবনবৃত্তান্ত তৈরী করো।

প্রশ্নমালা-১

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ভোকেশন শব্দটির অর্থ লেখ।
২। বৃত্তি বা পেশা কী?
৩। ক্যারিয়ার গাইডেন্স কী?
৪। ক্যারিয়ার শিক্ষার উপাদান কয়টি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

৫। স্বপ্নের ক্যারিয়ার মডেল তৈরীর প্রর্বতন কে?
৬। ক্যারিয়ার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লেখ।
৭। ক্যারিয়ার শিক্ষাকে ক্যারিয়ার গঠনের কার্যকর অবলম্বন উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
৮। কর্ম জগতের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

রচনামূলক প্রশ্ন :

৯। নিজেকে জানা বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করো।
১০। বিকল্প পেশা সম্পর্কে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করো।
১১। ক্যারিয়ার শিক্ষার উপাদানসমূহের রেখাচিত্র অংকন করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবিকা ও কর্মজগৎ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

(Basic ideas about livelihood and career)

২.১ 'পেশা' ও 'জীবিকা' উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিবরণ

পেশা যা দিয়ে একজন ব্যক্তি জীবিকা অর্জন করে থাকে। দৈনন্দিন জীবনে পেশা আর জীবিকা সমার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়, তবে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি **জীবিকা** হলো মূলত ব্যক্তি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতার সম্মিলিত রূপরেখার প্রতিফলন। জীবিকার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরণের পেশা গ্রহণ করে থাকে। অন্যদিকে পেশা বা বৃত্তি হলো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ কাজের নাম। যেমন চিকিৎসক, স্থপতি, ধাত্রী ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পেশা নিয়ে কাজ করে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা, দক্ষতা আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। চাকরি হলো একটি নির্দিষ্ট পেশার অন্তর্গত বিশেষ একটি পদ বা অবস্থা। যেমন কোনো ডেভেলপার সংস্থার প্রধান স্থপতি।

নিজের অবস্থানের উন্নতির জন্য উত্তরোত্তর প্রশিক্ষণ, ক্রমাগত পরিবর্তন ও প্রচেষ্টা, মানিয়ে চলা, খাপ খাওয়ানো প্রভৃতি ধাপ সফলতার সাথে পেরিয়ে **'পেশা'** ও **'জীবিকা'**র উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

সময় গতিশীল। সময়ের এই গতিশীলতার সাথে পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপাশ, কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট। সময়ের এই গতিশীলতায় আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দি আগেও আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষিকাজ কিংবা কৃষিভিত্তিক শিল্পে শ্রম দেওয়া। আজ বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য। আজকের দিনে আমাদেরকে এরূপ পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের সাথে খাপ খাওয়াতে পারলে **'পেশা'** ও **'জীবিকা'** উন্নয়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হবে।

২.২ বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস:

জীবিকার্জনের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরণের পেশা গ্রহণ করে থাকে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে পেশাকে প্রধানত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন :

১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি

২। আত্মকর্মসংস্থান

৩। ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১। মজুরি ও বেতনভিত্তিক পেশা : কোন প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট মজুরি বা বেতন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিনিময়ে চাকরি গ্রহণ করা হলে তাকে মজুরি ও বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান বলে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ে বহুসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। ফলে চাকরি কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কাজের নিরাপত্তা, নিয়মিত আয় প্রবাহ, পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য কর্মসংস্থান হিসেবে চাকরি মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে শিল্প ও ব্যবসা/বাণিজ্যের প্রসার না হওয়ায় বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। তাছাড়া দেশের সকল মানুষের জন্য বেতন ও মজুরিভিত্তিক চাকরি কর্মসংস্থান সম্ভবও নয়।

২। আত্মকর্মসংস্থান : নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে চাকরি না করে স্বীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ইলেকট্রিশিয়ান ইলেকট্রিক্যালের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে গণ্য করা যায়।

তাছাড়া আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক ১৫৫টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ ৬৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বেশ কয়েকটি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এ সমস্ত যুব উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেসিক ট্রেড কোর্স ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নানাবিধ কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যেমন-হস্ত শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঠের কাজ, মেরামত কাজ, হাঁস মুরগি পালন, মাছের চাষ, শাক-সবজি চাষ, ফুলের চাষ, পোশাক তৈরি ইত্যাদি। এসব কাজে বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এজন্য প্রয়োজন সামান্য প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগী মনোভাব।

৩। ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগঃ কর্মসংস্থানের উৎস হিসেবে ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগের গুরুত্ব পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই স্বীকৃত। আমাদের দেশে ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অসীম সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। নিজ উদ্যোগে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করাকেই পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এরকম ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হওয়াকে ব্যবসা বা শিল্পোদ্যোগ বলে। মালিক নিজেই তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারি নিয়োগ করেন।

২.৩ অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা

অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা হলো এমন এক ধরনের পেশা যা কোনো অঞ্চলের সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে থাকে। এটি কখনও তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসে বলে তা ঐতিহ্যগত পেশা হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে, যা উন্নয়ন ও উৎপাদনে সমান গুরুত্ব বহন করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের কাঁথা শিল্প, বগুড়া ও যশোর অঞ্চলের ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরীর কুটির শিল্প প্রভৃতি।

২.৪ সৃজনশীল ও কারিগরি দক্ষতানির্ভর পেশা

বাংলাদেশে সৃজনশীল ও কারিগরি দক্ষতানির্ভর পেশা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে রয়েছে বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

পোশাকশিল্প

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বিশ্বখ্যাত। এদেশের তৈরি পোশাকের যেমন বিশ্বব্যাপী কদর রয়েছে, তেমনি আছে পোশাক তৈরির বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতকারী শিল্পের। আমাদের দেশে আশির দশক থেকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে তৈরি পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এ শিল্পের অভ্যন্তরীণ বাজারও দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। এ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা এ শিল্পে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা এবং বেতন উপযুক্ত হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষিত তরুণ পোশাকশিল্পে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করেছেন। দেশের ক্রমবিকাশমান এ শিল্পে যে শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। অর্ধশিক্ষিত এবং দেশের পিছিয়ে পড়া অনেক বেকার যুবক-যুবতী তাদের শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

গার্মেন্টস শিল্পে মার্চেন্ডাইজার, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ফ্যাশন ডিজাইনার,প্রোডাকশন কর্মকর্তা, বাণিজ্য বিষয়ক কর্মকর্তা ইত্যাদি পদে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে। এ পদগুলো ছাড়াও আরও কিছু পদ রয়েছে সেখানেও কাজ করার প্রচুর সুযোগ আছে যেমন– ফিনিশিং, ইনচার্জ, কাটিং মাস্টার, কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, ডাইং মেশিন অপারেটর, প্যাটার্ন মেকার ইত্যাদি। এসব পদে কাজ করে ক্যারিয়ারে সাফল্য অর্জন সম্ভব। পোশাকশিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো অবস্থাতেই এ সেক্টরে সাফল্য অর্জন করা যায় না। গার্মেন্টস সেক্টরে যেহেতু অনেক ভাগ আছে তাই কোন বিষয়ে ক্যারিয়ার শুরু করবে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন।

নৌযান ও নৌপরিবহন শিল্প

সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির কারিগর হওয়ার সুযোগ এখন আমাদের দ্বারপ্রান্তে। কারণ জাহাজশিল্পকে ঘিরে দেশে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত তৈরি হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান বিদেশেও আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ রপ্তানি করছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে বাজারের চাহিদা বাড়ায় দেশের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত দক্ষ জনবল খুঁজতে হচ্ছে। ফলে এ খাতে দিন দিন কাজের সুযোগ বাড়ছে। গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী একজন নেভাল আর্কিটেক্ট জাহাজের নকশা প্রণয়ন করেন। পুরো জাহাজের নকশাকে আবার কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। এরপর শিপ বিল্ডিং প্রকৌশলী ডিজাইন অনুযায়ী জাহাজের ওয়েল্ডিং, ফিটিং, ডেন্টিং, পেইন্টিং ও গুণগত যন্ত্রাংশের ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন। পুরো কাজটি করতে হয় নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

১০১৪

জাহাজশিল্পে শিপ বিল্ডিং প্রকৌশলীর পাশাপাশি সহকারী প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করার সুযোগ আছে। বিদেশেও ভালো বেতনে এ পেশার ব্যাপক চাহিদা ও কাজের সুযোগ আছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সরকারিভাবে পরিচালিত নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইন শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি ও দুই বছর মেয়াদি শিপ বিল্ডিং, শিপ ফেব্রিকেশন ও শিপ বিল্ডিং অ্যান্ড মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যানশিপ কোর্স চালু রয়েছে।

অটোমোবাইল শিল্প

মানুষের চলাচলের প্রধান বাহন হচ্ছে গাড়ি। বিগত বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরে গাড়ির ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে। আগের তুলনায় বর্তমানে দেশে অনেক বেশি গাড়ি আমদানি করা হচ্ছে। তোমরা জেনে আনন্দিত হবে যে বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক বাস, ট্রাক, অটোরিকশার শুধু চেসিস আমদানি করা হয়, এগুলো তৈরির কাজ এখানে সম্পন্ন হচ্ছে। আমদানিকৃত এসব গাড়ি পরবর্তী সময়ে সার্ভিসিং বা মেরামতের জন্যই অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশ লাভ করছে দ্রুতগতিতে। এ শিল্পের নানা ধরনের কাজে দক্ষ অটোমোবাইল প্রকৌশলী প্রয়োজন। তাই অটোমোবাইল শিল্পে যারা আগ্রহী তাদের দৃষ্টি এখন এদিকেই।

অটোমোবাইল শিল্পের প্রধান কাজ হচ্ছে নতুন গাড়ি তৈরি এবং তা বিক্রয় ও পরবর্তী সার্ভিসিং এবং মেরামতসহ যাবতীয় কারিগরি কাজ। সাধারণত এই শিল্পে কাজের ধরণ বিবেচনায় তিনটি ভাগ রয়েছে। এগুলো হলোঃ উৎপাদন, বিপণন এবং সার্ভিসিং। উৎপাদন ক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন প্রকৌশলীরা এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা দেখানোর ব্যাপক সুযোগ পান। সেলস বিভাগে গাড়ি বিপণন, বিক্রয় ও বিতরণের কাজ করা হয়ে থাকে। গ্রাহকের কাছে গাড়ি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রদান ও ইঞ্জিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা এই বিভাগের মূল দায়িত্ব। বিক্রয় পরবর্তী সার্ভিসিং বলতে ওয়ারেন্টিযুক্ত বা সার্ভিস ফি দিয়ে গাড়ি মেরামত ও সার্ভিসিং করা হলো সার্ভিসিং বিভাগের প্রধান কাজ।

২.৫ এলাকার শিল্প ও কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

এলাকার শিল্প ও কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিম্নরূপ উপাদানের আলোকে নির্ধারিত হয়। যেমন-

১. যোগাযোগ ব্যবস্থা।
২. গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৩. কাঁচামালের আধিক্য
৪. রাজনৈতিক স্থিতিশিলতা
৫. শ্রমিকের সহজলভ্যতা
৬. বাজার ও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা
৭. আবাসন সুব্যবস্থা প্রভৃতি

২০২৪

২.৬ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিত করা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই কারিগরি শিক্ষাই প্রথম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে যে যে পেশাগুলো অগ্রগণ্য তা হলো–

১. ডাক্তার

২. ইঞ্জিনিয়ার

৩. টেকনিশিয়ান

৪. নার্স

৫. ড্রাইভার

৬. দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি।

২.৭ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের(Technical Vocational Education Training) (TVET) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ধারণা

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের (TVET) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশকে খুব সহজেই এগিয়ে নেওয়া সহজ হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ ২৩টি মন্ত্রণালয় এবং প্রায় ৩২টি বিভাগ বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা- প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রায় সাত সহস্রাধিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরে প্রায় ১১ লক্ষ শিক্ষার্থী ও যুবক যুবতীকে পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ও আত্মকর্মে নিয়োজিত টিভিইটি গ্রাজুয়েটদের পেশাভিত্তিক কর্মক্ষেত্র ও সম্ভাব্য আয় এর তথ্যাবলী:

কোর্স/ট্রেড/ টেকনোলজির নাম	অকুপেশন/পেশার নাম	সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র	সম্ভাব্য আয়
এসএসসি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) /শর্টকোর্স ট্রেড/টেকনোলজিঃ কম্পিউটার ট্রেড/ টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেনেন্স, ইলেকট্রনিক্স,ড্রেস মেকিং/ক্লদিং/ গার্মেন্টস,অটো মেকানিক্স কাম ড্রাইভিং	ডাটা অপারেটিং/ডাটা অ্যাডমিন/ কম্পিউটার অপারেটিং/আইটি টেকনিশিয়ান/হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান/ কল সেন্টার অপারেটর কাম ম্যানেজার/ হার্ডওয়্যার টেকনিশিয়ান ল্যাপটপ টেকনিশিয়ান/ প্রিন্টার টেকনিশিয়ান/ নেটওয়ার্ক টেকনিশিয়ান	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে	প্রাথমিকভাবে ৫-১০ হাজার এবং ১ বছরের ব্যবধানে ১৫-২০ হাজার
	ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান, জেনারেটর অপারেটর কাম ইলেকট্রিশিয়ান,সিএফএল/এলইডি লাইট টেকনিশিয়ান	বৈদ্যুতিক বাল্ব উৎপাদন,বিক্রয় ও সেবা প্রতিষ্ঠানে সহ নির্মান কাজের প্রতিষ্ঠানসমুহে	১০-২০ হাজার টাকা
	মিউজিক/লাইট/সাউন্ড সিস্টেম টেকনিশিয়ান/ মোবাইল ফোন টেকনিশিয়ান	মিউজিক সিস্টেম বিক্রয় কেন্দ্র সার্ভিসিং সেন্টারে	১০-৩০ হাজার
	টেইলারিং কাটার মাস্টার/টেইলারিং ম্যানেজার/	টেইলারিং হাউসে	১০-২০ হাজার
	অটো ইলেকট্রিশিয়ান	অটোমোবাইল গ্যারেজ/ ওয়ার্কশপ/সার্ভিসিং সেন্টার /মটর পার্টস বিক্রয় কেন্দ্র	১০-৩০ হাজার
	টিভি টেকনিশিয়ান	দেশে-বিদেশে টিভি সার্ভিসিং সেন্টার এবং বিক্রয় কেন্দ্রে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	সাবস্টেশন,পাওয়ার সাপ্লাই টেকনিশিয়ান	দেশে-বিদেশে সরকারি -বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ	দক্ষতার স্তর ও অঞ্চল ভেদে মাসিক আয় ২০-৪০ হাজার টাকা
	রিমোট কন্ট্রোল টেকনিশিয়ান	দেশে-বিদেশে যে কোন ইলেকট্রনিক সামগ্রী বিক্রয় ও সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে।এছাড়া নিজেও রিমোট কন্ট্রোল সার্ভিসিং সেন্টার খুলে নিজের ও অন্যদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।	১০-২০ হাজার
	ওভেন টেকনিশিয়ান	দেশে-বিদেশে যে কোন ওভেন সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া নিজের ও ওভেন সার্ভিসিং সেন্টার খুলে নিজের ও অন্যদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে।	১০-২০ হাজার
	ফ্রিজ এয়ার-কন্ডিশন টেকনিশিয়ান	দেশে- বিদেশে যে কোন ফ্রিজ এয়ার-কন্ডিশনস ওয়ার্কশপ, সার্ভিসিং সেন্টার এবং এই সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার

টেবিল-৪ (চলমান)

২০২৪

	ওয়াশিং মেশিনে টেকনিশিয়ান	দেশে-বিদেশে যে কোন ওয়াশিং মেশিন সার্ভিসিং সেন্টার, লন্ড্রি ও বিক্রয় কেন্দ্রে কাজের সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিজের ও ওয়াশিং মেশিন সার্ভিসিং সেন্টার খুলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে	১০-২০ হাজার
	হেভি ড্রাইভার	দেশে-বিদেশে লজিস্টিক গাড়িচালনায়, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজের সুযোগ রয়েছে।	২০,০০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ টাকা এবং দেশের বাইরে ৫০ হাজার -১ লক্ষ টাকা।
	লং ভেহিকল ড্রাইভার	দেশে-বিদেশে লজিস্টিক কোম্পানির গাড়িচালনায়,বড় বড় শিল্পকারখানায় এবং ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজের সুযোগ রয়েছে।	৩০-৫০ হাজার
	বাস-ট্রাক বডি বিল্ডিং টেকনিশিয়ান	দেশে যে কোন বডি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ এবং বাস ও ট্রাক সংযোজন শিল্পে কাজের সুযোগ রয়েছে ।	২০-৩০ হাজার
	অটো মেকানিক	দেশে-বিদেশে যে কোন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার এবং অটোমোবাইল বিক্রয় কেন্দ্র ও অটোমোবাইল সংযোজন কেন্দ্রে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	অটো-ডেন্টিং পেইন্টিং	দেশে- বিদেশে যে কোন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ ও অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	হুইল এলাইনমেন্ট	দেশে- বিদেশে যে কোন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ অথবা অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১৫-৩০ হাজার
	ফুয়েল স্টেশন ম্যানেজার	দেশে যে কোন ফুয়েল পাম্প স্টেশনে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	ফুয়েল পাম্প অপারেটর	দেশে যে কোন ফুয়েল পাম্প স্টেশনে এই কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	কার সার্ভিসিং টেকনিশিয়ান	দেশে যে কোন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে অথবা সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১৫-৩০ হাজার
	ডায়াগনস্টিক টেকনিশিয়ান	শপ, অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার এবং অটোমোবাইল বিক্রয় কেন্দ্র ও অটোমোবাইল সংযোজন কেন্দ্রে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার
	অটোমোবাইল স্পেয়ারপার্টস সেলসম্যান	দেশে যে কোন অটোমোবাইল খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয় কেন্দ্রে কাজের সুযোগ। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোক্তা হিসাবে নিজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন ।	১০-২০ হাজার
	ফুয়েল পাম্প সার্ভিসিং মেকানিক	যে কোন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ/ অটোমোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারে কাজের সুযোগ রয়েছে।	১০-২০ হাজার

২০২৪

টেবিল-৪

প্রশ্নমালা-২

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পেশা কী?

২. জীবিকা বলতে কী বোঝায়?

৩. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা কাকে বলে?

৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পেশা কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস কীভাবে করা যায়?

২. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা বিষয়ে যা জান লেখ।

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশা চিহ্নিতকরণের উপায় বিবৃত করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'পেশা' ও 'জীবিকা' উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও।

২. বাংলাদেশে পেশার শ্রেণিবিন্যাস করো।

৩. অঞ্চলভিত্তিক/ঐতিহ্যগত পেশা, উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে যা জান লেখ।

১০১৪

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মকর্মসংস্থান

(Self- Employment)

ভূমিকা

নিজের জীবিকা নিজের প্রচেষ্টাতে অর্জনের অভিপ্রায়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাই ব্যবসায় উদ্যোগ। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসায় উদ্যোগ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়টি অর্থনীতিবিদ ক্যানটিলন সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে প্রচলন করেন। মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করে। জীবিকার উপায় হিসেবে কর্মসংস্থান সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির একান্ত কাম্য। উন্নয়নশীল দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিল্পে স্থবিরতার জন্য চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। তাই বেকার সমস্যা মারাত্মক আকারে দেখা দিচ্ছে। নিজের জীবিকা নিজের প্রচেষ্টাতে অর্জনের উপায় হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান। বর্তমান বিশ্বে কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস হিসেবে আত্মকর্মসংস্থান পেশা হিসেবে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

৩.১ কর্মসংস্থান ধারণা ও আত্মকর্মসংস্থান

নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করাকে কর্মসংস্থান বলে। সাধারণ অর্থে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মংস্থান বলা হয়।

ব্যাপক অর্থে জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো মানুষ অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থান বলা হয়। এ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কারও অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে কাজ না করে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী সংস্থাপনের ব্যবস্থা করে প্রদান করে। ব্যবসা হচ্ছে মূলত আত্মকর্মসংস্থানের উপায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, একজন কারসার্ভিসিং কারিগর যখন একটি জুতা উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরিতে কর্মচারী হিসেবে কাজ না করে নিজেই জুতা তৈরি ও বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তখন তার এ পেশাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, কনস্ট্রাকশন টেকনিশিয়ান ইত্যাদি। আত্মকর্মসংস্থান ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। কারণ এ ধরনের পেশা উদ্যমী মানুষের জন্য দ্রুত সাফল্য এনে দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলের যে সম্ভাবনা ও সম্পদ রয়েছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সর্বোপরী আত্মকর্মসংস্থান পেশার মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

২। আমাদের দেশে স্বল্প মূলধনের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবসা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এদেশে প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে তরুণদের ব্যবসাকে বিকল্প পেশা হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় কৌশল হতে পারে। ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে একদিকে একজন তরুণ তার নিজের জন্য কর্মসংস্থানের উপায় খুঁজে পাবে, অন্যদিকে আরো কিছু তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এতে শ্রমবাজারের উপর চাপ কমে যাবে এবং দেশের সমগ্রিক বেকার সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে।

৩.২ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার সংজ্ঞা

কোনো কিছু করার ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশকে উদ্যোগ বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মোদ্যোগকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে মুনাফা অর্জনের আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়াকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে। ব্যবসায় উদ্যোগ এমন কতগুলো গুণের সমষ্টি যা সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই কম বেশি পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নে ব্যবসায় উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। আর্থার কোল (Arther Kohl)-এর মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হলো এমন একটি উদ্দেশ্যমুখী কার্যক্রম, যেখানে সিদ্ধান্তগুলো পর্যায়ক্রমে মেনে চলা যায়'।

২। বসু ও মৌলিকের মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে অর্থনৈতিক সুযোগকে বুঝে কাজে লাগানো প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে 'প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করে তোলা'।

৩। জোসেফ এ. সুমপিটার (Joseph A. Schumpeter)-এর মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে এমন এক কার্য যাতে নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস অনুসন্ধান এবং প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নেওয়া ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করাকে বোঝায়।

পরিশেষে, উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, ব্যবসায় উদ্যোগ এমন একটি কার্যক্রমকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণসহ উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বিতরণ করে মুনাফা অর্জন করাকে বোঝায়।

আর.আই রবিনসন (R.I. Rabinson)-এর মতে, 'ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজ প্রচেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী শক্তি এবং প্রেরণার মাধ্যমে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন'।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, ব্যবসায় উদ্যোক্তা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বীয় উদ্যম, কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবনী শক্তি ব্যবহার করে একটি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গঠন করে একে এবং সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৩.৩ ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

ব্যবসায় সাফল্য শুধু মূলধন ও অন্যান্য উপকরণের উপর নির্ভর করে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন একজন সফল উদ্যোক্তা। কেননা একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক যোগ্যতার উপর ব্যবসায়ের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই একজন সফল ব্যবসায় উদ্যোক্তা হতে হলে তাকে কতকগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। তাই অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপে নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন।

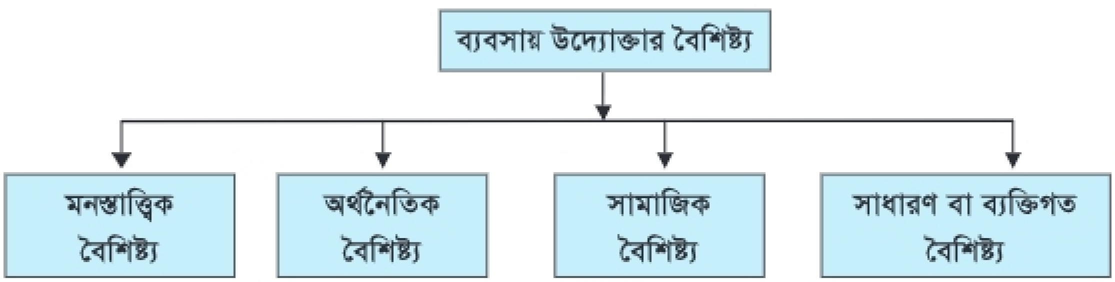

চিত্র-৩: ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

১। মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা, স্বীকৃতি, ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতা, মনোভাব, সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শক্তি, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস, প্রতিশ্রুতি, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা, দূরদৃষ্টি, জানার ইচ্ছা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য: উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পেশাগত অভিজ্ঞতা, মূলধনের জোগান ও ব্যবহার ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি অন্যতম।

৩। সামাজিক বৈশিষ্ট্য: উদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা পৈতৃক গুণাবলির প্রতিফলন, সামাজিক কার্যকলাপে উদ্যোগ গ্রহণ, বংশমর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদা অন্যতম।

৪। সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য: উদ্যোক্তার সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শিক্ষা, বয়স, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, বিক্রয় করার গুণাবলি, কৌশল, সততা, অর্থের প্রতি আগ্রহ, ত্যাগী মনোভাব, পরিশ্রমী, আন্তরিকতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্যবসায় উদ্যোক্তার শ্রেণিবিন্যাস

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিচার করলে শিল্পোদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

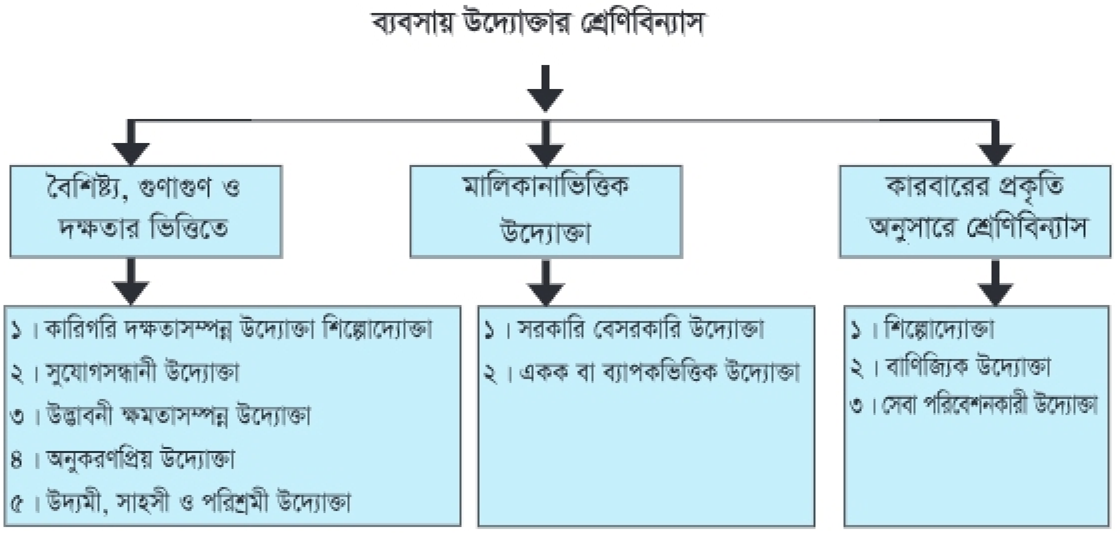

চিত্র-৪: ব্যবসায় উদ্যোক্তার শ্রেণিবিন্যাস

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় উদ্যোক্তার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

১। **কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা:** এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ তড়িৎকর্মা ও বাস্তবমুখী। এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বেশি আগ্রহী। ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এরা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ করেন।

২। **সুযোগসন্ধানী উদ্যোক্তা:** যে সকল শিল্পোদ্যোক্তা বাজারে বিদ্যমান সুযোগকে ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়নে চেষ্টা করেন, তাদেরকে সুযোগ সন্ধানী শিল্পোদ্যোক্তা বলে। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে কাজ করে থাকেন। তারা বিদ্যমান ও নতুন পরিস্থিতিতে সুযোগ গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে থাকেন। তারা নিজেদের কারিগরের চেয়ে একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে গণ্য করতে আগ্রহী। এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ অধিক জনসংযোগে বিশ্বাসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

১২৪

৩। **উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা (Innovative entrepreneur):** এ ধরনের উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। ব্যবসায়ের নিত্যনতুন ক্ষেত্র ও কলাকৌশল উদ্ভাবন, নতুন পণ্য আবিষ্কার ও বাজার সৃষ্টি, নতুন কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তারা নিজের উদ্যোগে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন, উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করে পণ্য উৎপাদন করেন এবং প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখার চেষ্টা করেন। এ ধরনে শিল্পোদ্যোক্তারা উদ্ভাবন কার্য পরিচালনায় এবং উদ্ভাবনী কার্যসমূহকে শিল্পসম্মতভাবে ব্যবহারে আগ্রহী।

৪। **অনুকরণপ্রিয় উদ্যোক্তা (Imitative entrepreneur):** এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তাগণ নিজের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে অন্যের মাধ্যমে উদ্ভাবিত, আবিষ্কৃত এবং প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল অনুকরণ করতে আগ্রহী। এদের প্রধান লক্ষ্য অন্যের উদ্ভাবনমূলক কাজকে অনুকরণ করে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সাধন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। অনুন্নত দেশসমূহে সাধারণত এ ধরনের শিল্পোদ্যোক্তা পরিলক্ষিত হয়। তারা উন্নত দেশের উৎপাদন কৌশল নিজের দেশে প্রয়োগ করে সফলতা আনার প্রয়াস চালান।

৫। **উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী উদ্যোক্তা : (Dynamic, Brave and labourious)** এ ধরনের উদ্যোক্তাদের প্রচণ্ড সাহস ও উদ্যম থাকে। এ ধরনের উদ্যোক্তাকে নানাবিধ ঝুঁকি ও সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। তাই উদ্যম সাহস নিয়ে উক্ত ঝুঁকি সামলাতে তাদেরকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। এরা উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী হয় বলেই পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হন। তারা নিজেরা যেমন উদ্যমী, সাহসী ও পরিশ্রমী, অন্যদেরকেও অনুরূপ হতে উৎসাহী করেন।

মালিকানাভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা

(ক) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগঃ মালিকানা ভেদে শিল্পোদ্যোগকে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে ভাগ করা যায়। শিল্পোদ্যোগ সাধারণত একটি বেসরকারি কার্যকলাপ হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ ও প্রসার লাভ করছে। যেসব দেশে বৈদেশিক মূলধনের অভাব এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিল্পোদ্যোক্তার স্বল্পতা রয়েছে সেসব দেশে। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাসহ শিল্পায়নে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে সেক্টর কর্পোরেশন এবং আরো কিছুসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শিল্প স্থাপন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(খ) একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগঃ শিল্পোদ্যোগকে আবার একক এবং ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ হিসেবে বিভক্ত করা যায়। সত্তর এর দশকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে দেশে পরিবারভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সরকারের সামগ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা পরিবারভিত্তিক একদল বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকে একক শিল্পোদ্যোগ বলা হয়। এভাবে সরকারি নীতির মাধ্যমে ভাগ্যবান শিল্পসমৃদ্ধ পরিবার সৃষ্টির ফলে একটি অনগ্রসর অর্থনীতিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

যেসব দেশে উন্নয়নের ব্যাপক অংশজুড়ে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি জড়িত, সেখানে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির প্রয়োজন সর্বাধিক। এ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ কৌশল দেশের বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার ও অর্ধবেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশের প্রকট বেকার সমস্যার প্রেক্ষাপটে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ আবশ্যক।

ব্যবসার প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ (Classification based on nature of business):

১। শিল্পোদ্যোক্তা (Industrial entrepreneur): যে সমস্ত উদ্যোক্তা রাষ্ট্রীয় সম্পদের রূপগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে কারবার বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন পরিচালনা করে থাকে তাদেরকে শিল্পোদ্যোক্তা বলে। দেশে বৃহদায়তন কারবার গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সব উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২। **বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা (Commercial entrepreneur):** এ ধরনের উদ্যোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন প্রণালীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এরা উৎপাদকের কাছ থেকে ব্যাপক হারে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। খুচরা বা পাইকারি ব্যবসায়ী এ শ্রেণির উদ্যোক্তার অন্তর্ভুক্ত।

৩। **সেবা পরিবেশন উদ্যোক্তা (Enterpreneurship to serve the service):** যে সকল উদ্যোক্তা মানুষের জনকল্যাণমূলক এবং অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সেবাকর্মের সৃষ্টি ও সেগুলোর বিতরণের উদ্দেশে কারবার গঠন করেন তাকে সেবা পরিবেশক উদ্যোক্তা বলে। যথা-ব্যাংক, পরিবহন সংস্থা, বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইত্যাদি।

সংজ্ঞা ও পরিধি

ক্ষুদ্র ব্যবসাঃ অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করে ক্ষুদ্র পরিসরে পণ্যদ্রব্য বা সেবা প্রদান অথবা পণ্যদ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে কাছে বিক্রয় কার্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে। বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্বল্প পুঁজি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগকৃত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ব্যবসা বলে গণ্য করা হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসার পরিধি ব্যক্তি পর্যায়েই সর্বাধিক বাস্তবায়িত হয় তবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র বা ব্যক্তিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাসমূহ (Advantage of Small Business)

নিম্নে ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১। **সহজ গঠনপ্রণালীঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসা গঠন করা খুব সহজ। যে কোনো লোক তার পছন্দ মতো ক্ষুদ্র ব্যবসা সংগঠিত করে ব্যবসায়িক কার্য পরিচালনা করতে পারে।

২। **মূলধন গঠনের সুবিধাঃ** ক্ষুদ্র ব্যবসা স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হয়। ফলে এর মালিক সহজেই কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মূলধনের সংস্থানের মাধ্যমে ব্যবসা গঠন করতে পারে।

৩। আইনের জটিলতামুক্ত: ক্ষুদ্র ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য আইনগত কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। তাই সহজে এরূপ ব্যবসা গঠন করা যায়।

৪। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: ক্ষুদ্র ব্যবসায় সাধারণত এক মালিকানার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। মালিক নিজেই ব্যবসার সকল সম্পত্তির মালিক বিধায় এরূপ ব্যবসা যে কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

৫। পরিবর্তনশীল: ভোক্তাদের রুচির সাথে তাল মিলিয়ে যে কোনো সময়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভব। এতে ব্যবসায়ীর পক্ষে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

৬। তত্ত্বাবধান: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক নিজেই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। এতে তার পক্ষে ব্যবসায়ের যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করা সহজ হয়।

৭। ভোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো এর মাধ্যমে ভোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে ভোক্তাদের চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা যায়।

৮। ব্যক্তিগত দক্ষতার বিকাশ: ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিককে ব্যবসায়িক বিভিন্ন কার্যক্রম নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হয়। এতে ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, যা তার ব্যবসায়িক দক্ষতা পরিচায়ক।

৯। ভোক্তাদের সুবিধা: ক্ষুদ্র ব্যবসা যে কোনো স্থানে গঠন করা যায়। এ ধরনের ব্যবসা ভোক্তাদের আবাসিক এলাকার আশেপাশেই সাধারণত গড়ে ওঠে। এতে ভোক্তারা তাদের চাহিদামাফিক পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পায়।

১০। ব্যক্তিগত উদ্যোগ: ক্ষুদ্র ব্যবসার অর্জিত সুফল সবটুকুই মালিকের নিজের প্রাপ্য। তাই ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য মালিকের প্রচেষ্টার অভাব দেখা দেয় না।

ক্ষুদ্র ব্যবসার অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Small Business)

ক্ষুদ্র ব্যবসা হতে অর্জিত সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। মূলধনের অপর্যাপ্ততা: ক্ষুদ্র ব্যবসার মূলধনের স্বল্পতা একটি প্রধান অসুবিধা। মূলধনস্বল্পতার কারণে এটি অনেক সময় ব্যবসায়িক সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না।

২। স্থায়িত্বের অভাব: ক্ষুদ্র ব্যবসার অস্তিত্ব মালিকের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। যে কোনো কারণে মালিকের অস্তিত্ব বিলীন হলে ব্যবসারও বিলোপ ঘটে।

৩। অসীম দায়: ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিককে ব্যবসায়ের সমুদয় দায় বহন করতে হয়। কোনো কারণে ব্যবসায় দেনা হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়বদ্ধ হয়।

৪। আয়তনগত সীমাবদ্ধতা: স্বল্প মূলধন নিয়ে এ ধরনের ব্যবসা গঠিত হয় বিধায় সীমিত পরিসরে এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে এর মাধ্যমে কখনও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করা যায় না।

৫। **কর্মচারীদের অসুবিধা:** ক্ষুদ্র ব্যবসার আয়তন ছোট হওয়ার দরুণ এ কারবারে নিযুক্ত কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা যেমন পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হয় না এতে দক্ষ কর্মচারী অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যায়।

৬। **মালিকের খামখেয়ালিপনা:** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকের খামখেয়ালিপনার জন্য কর্মচারীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অনেক সময় বিনা কারণে কর্মচারীদের বিদায় করে দেওয়া হয়।

৩.৫ বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব

বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্যোগের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১। **বেকারত্ব দূরীকরণ:** বর্তমানে বেকারত্ব বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর অন্যতম। এ দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই বললেই চলে। সরকারের একার পক্ষে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব মোকাবিলার আর কোনো পথ নেই। মোট কথা, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

২। **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে জনগণকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল করে দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নতুন নতুন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। এছাড়াও আত্মকর্মসংস্থান মূলক কার্যক্রম ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে সহায়তা করে

৪। **জনশক্তির সদ্ব্যবহার:** জনশক্তি একটি দেশের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় তখনই, যখন তাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু এ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে না পারলে তা দেশ ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব রয়েছে।

৫। **সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি:** কর্মহীন বেকারদের কেউ পছন্দ করে না। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্ম কাজের সংস্থান হলে উদ্যোক্তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন: যুবসমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা যায়। এ জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭। জাতীয় আয় বৃদ্ধি: আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যার ফলে দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

৮। উদ্যোক্তা সৃষ্টি: আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবসায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ মুনাফা অর্জন করে। এতে করে দেশে নতুন উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তা সৃষ্টির সাথে সাথে সংস্থান বৃদ্ধি পায়।

৯। সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা: আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক বেকার লোককে স্বকর্মে নিযুক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে আত্মকর্মসংস্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এদেশে শুধু দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূরীভূত হবে তা নয় বরং সামাজিক শৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে।

৩.৬ একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ

Reasons for Success and Failure in Business of an Entrepreneur

একজন উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল হওয়ার উপর শুধু উদ্যোক্তার নিজের উন্নয়ন নির্ভর করে না বরং দেশ ও দেশের উন্নতিও নির্ভর করে। উদ্যোক্তার উদ্যোগ সফল বা ব্যর্থ হওয়া অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে যারা ব্যবসা পরিচালনা করেন, তারাই কেবল সফল হন। নিম্নে ব্যবসায় সফল ও ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

১। ব্যবসায় সঠিক পণ্য নির্ধারণ: সঠিক পণ্য নির্ধারণ ব্যবসায় সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। একজন উদ্যোক্তা কোনো পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে পণ্যের বাজার চাহিদা কীরূপ, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে বহুল ব্যবহৃত পণ্যের চেয়ে নতুন সম্ভাবনাময় পণ্য নির্বাচন করলে সাফল্য অনিবার্য।

২। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন: সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর ব্যবসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে কী, কখন এবং কীভাবে একটি কাজ করতে হবে তা অগ্রিম চিন্তাভাবনা করার নামই পরিকল্পনা। ব্যবসা-বাণিজ্য সফলভাবে পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কারণ সঠিক পরিকল্পনার অভাব ব্যবসায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৩। পর্যাপ্ত মূলধন: ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা ব্যবসায় সফলতার অন্যতম শর্ত। সুতরাং ব্যবসার সাফল্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদি এবং স্বল্পমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থান করা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে ব্যবসায় কার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪। পণ্য বাজারজাতকরণ: বাজারজাতকরণের অর্থ হচ্ছে সঠিক মূল্যে যথাসময়ে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। পণ্য শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, তা বিক্রির ব্যবস্থাও করতে হবে। এর জন্য ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচার ব্যতীত কোনো পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুপরিকল্পিতভাবে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবসায় সাফল্যের চাবিকাঠি।

৫। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা: শিক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ব্যবসার সফলতার পূর্বশর্ত। ব্যবসায়ে অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা থাকলে ব্যর্থতার চেয়ে সফলতার সম্ভাবনাই বেশি। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে ব্যবসায় পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ সবচেয়ে বেশি সফল হন।

৬। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা: উদ্যোক্তাকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা জ্ঞান ছাড়া প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপনার মৌলিক কাজ যেমন- পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা যে কোনো উদ্যোক্তার সফলতার জন্য অপরিহার্য। উদ্যোক্তার নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী কাজ করলে ব্যর্থ হতে পারে।

৭। হিসাবরক্ষণ: সুষ্ঠু ও যথাযথ হিসাবরক্ষণের উপর ব্যবসার সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যথাযথভাবে হিসাব না করলে ব্যবসা ব্যর্থ হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ব্যবসায়ের সফলতার জন্য একান্ত আবশ্যক। যে উদ্যোক্তা উর্পযুক্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করেন তার ব্যবসায় সাফল্য আসবে এসব শর্ত লংঘন করলে ব্যবসায় বিপর্যয় আশংকা থাকে।

প্রশ্নমালা-৩

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উদ্যোগ কী?

২. ব্যবসা উদ্যোক্তা কে?

৩. উদ্যোগ বিষয়টি অর্থনীতিতে কে প্রথম প্রচলন করেন?

৪. আত্মকর্মসংস্থান কী?

৫. আত্মকর্মসংস্থানকে প্রধানত কত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

৬. আত্মকর্মসংস্থানকে কী কী শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?

৭. ব্যবসায় উদ্যোক্তার কী গুন অর্জন করতে হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিল্প উদ্যোগের সংজ্ঞা দাও।

২. শিল্পোদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী ?

৩. একজন উদ্যোক্তার হতে মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সমূহ কী কী ?

৪. উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা কাকে বলে?

৫. আত্মকর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়?

৬. মজুরি ও বেতনভিত্তিক চাকরি কাকে বলে?

৭. ক্ষুদ্র ব্যবসা কাকে বলে?

৮. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা কী উল্লেখ করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায় উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

৭. ক্ষুদ্র ব্যবসার সুবিধাগুলো আলোচনা করো।

১০. একজন উদ্যোক্তার ব্যবসায় সাফল্য লাভ এবং ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করো।

২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেষণা ও পেশা নির্বাচন

(Motivation and Selection of Occupation)

ভূমিকা

একজন ব্যবসা উদ্যোক্তাকে কর্মীদের মাধ্যমে কাজ আদায় করে নিতে হয়। একজন কর্মীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা যতই থাকুক না কেন, কর্মস্পৃহা না থাকলে সে কোনো কাজই সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। যে সমস্ত উপাদান একজন কর্মীর কর্মস্পৃহা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম সেগুলোই হলো প্রেষণা। প্রেষণা একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। মানুষের কাজের সাথে প্রেষণা সংশ্লিষ্ট। তাই প্রত্যেক মানুষের কর্মে চাই প্রেষণা। কেননা প্রেষণাই মানুষকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা কার্যক্রম কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪.১ প্রেষণা'র ধারণা ও সংজ্ঞা

আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা কার্যক্রমে কর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ইংরেজি 'Motivation' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো প্রেষণা। এ ইংরেজি শব্দটি ল্যাটিন 'Movere' শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ হলো 'to move' অর্থাৎ চালনা করা বা গতিশীল করা।

সাধারণ অর্থে মানুষের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলার আগ্রহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেই প্রেষণা বলে।

ব্যাপক অর্থে প্রেষণা হলো প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কর্মক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও প্ররোচিত করার প্রক্রিয়া।

প্রেষণা এমন কিছু বিষয় যা একজন ব্যক্তিকে একটি কার্য উত্তমরূপে সম্পাদন করতে মানসিক শক্তি জোগায়। যেমন– পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর সুন্দরভাবে লিখতে পারলে শিক্ষক ভালো নম্বর দেন, সংশ্লিষ্ট ছাত্রের প্রশংসা করে এবং পুরস্কারস্বরূপ বই, খাতা, কলম উপহার দেন। এগুলো অর্জনের প্রত্যাশায় ছাত্র-ছাত্রীকে লেখাপড়ায় মনোযোগী ও পরিশ্রমী হতে এবং পাঠ উত্তমরূপে তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ বা প্রণোদিত করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এ মানসিক শক্তিই প্রেষণা।

৪.২ প্রেষণা চক্র, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব ও SWOT বিশ্লেষণ

প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle)

জন্মগতভাবে মানুষ অভাবজনিত প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত। তার একটি অভাব বা চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আরেকটি অভাব বা চাহিদা সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রেষণা চক্র হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে কর্মীরা উৎসাহিত হয়ে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের

২০২৪

লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয় এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। চক্রের আকারে এ প্রক্রিয়া আবর্তিত হয় বলে একে প্রেষণা চক্র বলে। প্রেষণা চারটি পর্যায়ে চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

যেমন–(১) অভাববোধ,(২) তাড়না, (৩) উদ্দেশ্যমূলক আচরণ লক্ষ্যবস্তু অর্জন বা উদ্দেশ্য সাধন। প্রেষণা একটি বিরামহীন প্রক্রিয়া। মানুষের অভাববোধ কখনো শেষ হয় না। একটি অভাব পূরণ হলে আবার নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়। আবার সে অভাবটি পূরণ হলে আর একটি অভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে জীবনব্যাপি চক্র আবর্তিত হতে থাকে। আর প্রেষণা আছে বলেই মানুষের মধ্যে নতুন নতুন কর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং কর্ম প্রেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়।

চিত্রে প্রেষণা চক্রটি উপস্থাপন করা হলো–

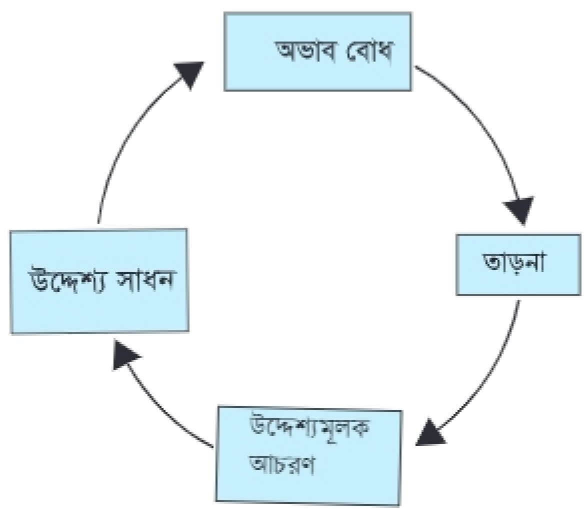

চিত্র: ৫ প্রেষণা চক্র

উপরোক্ত প্রেষণার স্তরগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। অভাব বোধ : প্রেষণা জৈবিক ও সামাজিক দুই প্রকারের হয়ে থাকে। মানুষের জৈবিক তাড়নায় যেসব প্রেষণার উদ্ভব ঘটে তাকে জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি। সামাজিক প্রেষণা হচ্ছে কৃতিত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, খ্যাতি, মর্যাদা ইত্যাদি। মানুষের সমাজ সভ্যতা, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন ব্যক্তির জীবনে এসব প্রেষণা সৃষ্টি হয়।

২. তাড়না

কোন কিছুর অভাববোধ বা চাহিদা থেকে প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। ওই অবস্থা প্রাণীকে অবাব পূরণের জন্য তাড়িত করে। অর্থাৎ, অভাবের তাড়নায় প্রাণী সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন- কোন প্রাণীকে যদি দীর্ঘ সময় খেতে না দেওয়া হয়, তাহলে খিদার তাড়নায় প্রাণীটির মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ওই অবস্থা দূর করার জন্ন খাদ্যের খোঁজে সক্রিয় হয়ে

২০২৪

৩। **উদ্দেশ্যমূলক আচরণ:** অভাব বোধ দূরীকরণের জন্য মানুষ সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রয়োজন মেটানোর জন্য কার্যে প্রবৃত্ত করে। এ প্রবৃত্তিকরণকেই উদ্দেশ্যমূলক আচরণ বলে। যেমন– মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়ি-ঘর তৈরি করে। শিশু ক্ষুধার্ত হলে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে।

৪। **উদ্দেশ্য সাধন:** মানুষ ক্ষুধার্ত হলে তা নিবৃত্ত করার জন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং এ লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় এবং শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যটি সম্পাদিত করে। প্রেষণার জন্যই মানুষ নিজের শক্তিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালনা করে থাকে।

কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব (Achievement motivation theory)

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রেষণা তত্ত্বগুলোর মধ্যে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। প্রফেসর ম্যাকলিল্যান্ড ও তার সহযোগী অ্যাটকিনসন কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের জনক। কৃতিত্বার্জন প্রেষণা বলতে কোনো একটি কাজ উত্তমরূপে করার প্রবল ইচ্ছাকে বোঝায়।

নিম্নে কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো :

১। ম্যাকলিল্যান্ডের মতে, 'কৃতিত্বার্জন প্রেষণা হচ্ছে একটি শিক্ষণীয় প্রেষণা যা ব্যক্তিকে উঁচুমানের কার্য-সম্পাদনে প্রেষিত করে'।

২। অধ্যাপক ম্যানফোর্ড-এর মতে, 'কৃতিত্বার্জন প্রেষণা প্রাণীর সঞ্জীবনী শক্তি, যা তাকে কাজ-কর্মে উচ্চমানের পরিচয় দিতে তাগিদ দেয়'।

SWOT বিশ্লেষণ

১৯৬৯ সালে Business Policy-Tex: and Cases বইটিতে প্রথম SWOT বিশ্লেষণের ধারণাটি উপস্থাপন করা হয়। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোক্তা তার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি আগেই বিশ্লেষণ করে জেনে নিতে পারে। যে পদ্ধতির মাধ্যমে এসব বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয় তাকে সামর্থ দুর্বলতা সুযোগ ঝুকি বিশ্লেষণ বলে।

Pearce & Robinson-এর মতে, 'SWOT' বিশ্লেষণ হলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও দুর্বলতা এবং বাহ্যিক সুযোগ ও ঝুঁকি সমূহকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার এবং এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির একটি কৌশল।

SWOT মডেলে S মানে Strength, W মানে Weakness, O মানে Opportunity, T মানে Threat নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে 'SWOT' কে দেখানো হলো-

চিত্র-৬: SWOT

১। **Strength (শক্তি বা ক্ষমতা):** প্রতিটি ব্যবসায় এমন কিছু অভ্যন্তরীণ উপাদান রয়েছে যা ব্যবসায় কার্যক্রমের অনুকূলে কাজ করে সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। এ উপাদানগুলোকে ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন: দক্ষ শ্রমিকের নিশ্চয়তা, উদ্যোক্তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি।

২। **Weakness (দুর্বলতা):** একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা চালানোর জন্য নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। এ সকল উপাদানকে দুর্বলতা বলা হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এ সকল দুর্বলতা অবশ্যই দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন–
উদ্যোক্তার অনভিজ্ঞতা, মুলধনের সমস্যা, অদক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি

৩। **Opportunity (সুযোগ):** একজন ব্যবসা উদ্যোক্তা পরিবেশ থেকে যত বেশি সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন, তিনি তত বেশি সফলতার সাথে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবেন। যেমন–
নতুন পণ্যের উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তির সুযোগ সরকারী নীতি ইত্যাদি।

৪। **Threat (হুমকি):** ব্যবসায় এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলো ব্যবসা উদ্যোক্তার ভয় করার কিছুই নেই। যেমন– রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোক্ত চারটি উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক সুবিধাজনক কৌশলটি গ্রহণ করে থাকেন।

৪.৩ প্রেষণা উন্নয়নের মাধ্যমে পেশা নির্বাচন

পেশা নির্বাচনে উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মানুষের **প্রেষণা উন্নয়নের** একটি বিশেষ গুণ। উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা ধারণকৃত ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১। **চরম উৎকর্ষের প্রতি অঙ্গীকার:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সংবলিত ব্যক্তিগণ চরম উৎকর্ষের মূল্য দিয়ে থাকেন। এরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকে অধিক কার্য সম্পাদন আশা করেন। তারা অল্প কর্মে সন্তুষ্ট হন না। ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক কাজ করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা আন্তরিকভাবে জোর প্রচেষ্টা চালান। কাজের সফলতার মধ্যে তারা আনন্দ পান।

২। **কাজের প্রতি অঙ্গীকার:** উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সংবলিত ব্যক্তিরা কোনো কাজ করতে অঙ্গীকার করলে ঐ কর্মে নিজেকে পুরাপুরি নিয়োগ করেন এবং কখনই কর্মকে ভুলে যান না। তারা কাজ অসমাপ্ত রাখতে পছন্দ করেন না। ব্যর্থতায় এ ধরনের ব্যক্তিরা ভেঙে পড়েন না। তারা বিশ্বাস করেন যে বড় সাফল্য রাতারাতি আসে না। ২০২৪

৩। পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী: এরা খুব সাহসী, অভিমানী এবং যে কোনো কাজে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। এসব ব্যক্তি তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবল সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সব সময় ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

৪। সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ: এ ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সুযোগ সন্ধান করতে ও সুযোগ গ্রহণ করতে বেশ দক্ষ। এরা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। সফলতা লাভের জন্য তারা সুযোগগুলোকে বাস্তব কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়িত করেন।

৫। পরামর্শ গ্রহণে আগ্রহী: এসব ব্যক্তি অত্যন্ত বাস্তবমুখী। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে তারা কখনও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করেন না। সাহায্যের প্রয়োজন হলে তারা বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছে না গিয়ে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করেন। তারা অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেরা যথেষ্ট সাহসী হন।

৬। সময় জ্ঞান: উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সময় জ্ঞান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন। এ ধরনের ব্যক্তিগণ চ্যালেঞ্জিং কাজের মধ্যেই সর্বাধিক আনন্দ পেয়ে থাকেন।

৭। নতুন ও অপরিচিত অবস্থায় আশাবাদ: কৃতিত্বার্জন প্রেষণাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অপরিচিত অবস্থায় সব সময় আশাবাদী থাকেন। নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা দিয়ে সার্বিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন।

পরিশেষে বলা যায় যে, কৃতিত্বার্জন প্রেষণা মূলত একটি সামাজিক প্রেষণা। সমাজে শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ সমাজ হতে এই প্রেষণা লাভ করে থাকে।

৮। দক্ষ ও অভিজ্ঞ: উচ্চ কৃতিত্বার্জন প্রেষণা সংবলিত ব্যক্তিগণ তাদের নিজের কাজে যথেষ্ট দক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়। এ সমস্ত ব্যক্তি সাহসের সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.৪ পেশা নির্বাচণেগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

পেশা নির্বাচনের জন্য একজন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক

১। পেশা নিশ্চিত করাঃ কর্মসংস্থানের জন্য নিজের শিক্ষা, দক্ষতা, পারিবারিক ইচ্ছা, ঝোঁক প্রবনতা, আর্থিক চাহিদা এবং আর্থিক সংগতির বিষয়গুলি বিবেচনা করে চাকুরীভিত্তিক অথবা আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা নির্ধারণ করতে হবে।

২। নিজের সামর্থ-দূর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি নির্ধারণ করাঃ বিশেষ করে যদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা নির্বাচন করা হয় সেক্ষেত্রে নিজের সামর্থ এবং দূর্বলতা চিহ্নিত করে পেশা নির্বাচন করলে তা কল্যানকর ও সাফল্যের বুনিয়াদ রচনা করে,সেইসাথে বাহ্যিক সুযোগ এবং ঝুঁকিসমূহ যথাসময়ে চিহ্নিত করা আবশ্যক। এসব বিষয় বিবেচনা করে পেশা নির্ধারণ করলে তা যথার্থ হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩। আর্থিক সুবিধা ও নিরাপত্তা বিবেচনা করাঃ পেশা নির্বাচনে আর্থিক সুবিধা ও নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই চাকুরী করার ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা বিবেচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। স্বনিয়োজিত পেশায় নিয়োজিত হলে আর্থিক বিনিয়োগের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

৪। সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতিঃ যে কোনো পেশা নির্বাচনে সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার বিষয়টি অগ্রগন্য এবং এবিষয়টি যেকোনো পেশাঅংশগ্রহণকারীকে বিবেচনা তথা পেশায় অংশগ্রহণের জন্য একটি অনিবার্য শর্ত হিসেবে কাজ করে।

৫। ভবিষৎ উন্নতি এবংক্যারিয়ার। সম্ভাবনাঃ যে কোনো পেশা নির্বাচনে ক্যারিয়ার সম্ভাবনা একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তাই পেশা শুরুর আগেই সংশ্লিষ্ট পেশায় অংশগ্রহণকারীকে ভবিষৎতের সম্ভাবনার বিষয়টি একটি বিশেষ বিবেচ্য হিসেগেণ্য্য করা হয়।

২০১৪

৪.৫ সঠিক পেশা নির্বাচনে প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহের ব্যবহার

সঠিক পেশা নির্বাচনে যেসব তথ্য সামগ্রির ব্যবহার করা হয়, তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১। **ন্যায্য বেতনঃ** কাজের বিনিময়ে শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট হারে যে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তাকে বেতন বলে।

২। **বোনাসঃ** বছরের শেষে অথবা কোনো উৎসবের সময় নিয়মিত বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দেওয়া হলে তাকে বোনাস বলে। বোনাস হলো একধরনের আর্থিক সুবিধা। এ সুবিধা পেলে কর্মীদের মধ্যে কাজ করার উদ্দীপনা জাগে।

৩। **বাসস্থান সুবিধাঃ** বাসস্থান মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রেষণা দানের অন্যতম উপায় হলো কর্মীদের মৌলিক অভাব পূরণে বাসস্থান সুবিধা প্রদান করা।

৪। **চিকিৎসা সুবিধাঃ** কর্মীদের সুস্বাস্থ্য উচ্চ মনোবলের পক্ষে অপরিহার্য। তাই কর্মীদের এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তার পরিবারের চিকিৎসা প্রদান কর্মীদের উদ্দীপ্ত করার একটি উল্লেখযোগ্য উপায়।

৫। **পরিবহন সুবিধাঃ** অনেক শ্রমিকই কর্মক্ষেত্র হতে দূরে অবস্থান করে। তাই কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা হলে কর্মীরা উৎসাহিত হয়।

৬। **রেশন সুবিধাঃ** নির্দিষ্ট সমায়ান্তে কম মূল্যে রেশন প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের মাধ্যমেও কর্মীদের উৎসাহিত করা যায়।

৭। **আর্থিক নিরাপত্তাঃ** ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, যৌথ বীমা, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে পারে। এ ব্যবস্থা করলে কর্মীরা উৎসাহ সহকারে কাজ করে।

৮। **চাকরির নিরাপত্তাঃ** সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও চাকরির নিরাপত্তা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলে কর্মীর মনোযোগ নষ্ট হয়। সুতরাং কোনো কর্মীর কাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে হলে তার চাকুরির নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন।

৯। **সুষ্ঠু কর্মপরিবেশঃ** কাজের উপযোগী সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ কর্মীকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলে ও তার কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি করে।

১০। **আকর্ষণীয় কাজঃ** কাজে তৃপ্তি না পেলে কর্মী উৎসাহিত হয় না। তাই কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করে দক্ষতা অনুযায়ী কার্যভার অর্পণ করতে হবে। এতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কর্মী কাজ করবে।

১১। **প্রশিক্ষণের সুযোগঃ** প্রশিক্ষণ কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এতে যে কোনো সমস্যা সমাধানে কর্মীর মনোবল বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মী আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে কাজ করে।

১২। **শ্রমিক সংঘ গঠন করার সুযোগঃ** শ্রমিক সংঘ গঠন করার অধিকার বর্তমানকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের অন্যতম দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শ্রমিক সংঘ গঠন করার সুযোগও কর্মীদের উৎসাহের একটি কারণ।

১৩। **প্রতিষ্ঠানের সুনামঃ** কর্মী যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তার সুনাম কর্মীদের মাঝে উৎসাহ জোগায়। ভালো প্রতিষ্ঠান কর্মীরা সহজে ছাড়তে চায় না। বরং তা তাদের গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৪। **সামাজিক মর্যাদাঃ** প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের চাহিদা পূরণের পর প্রত্যেক কর্মী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এমতাবস্থায় কর্মীকে সম্মানজনক পদমর্যাদা দান করলে উৎসাহের সাথে কাজ করবে।

২০১৪

প্রশ্নমালা-৪

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রেষণা কী?
২. প্রেষণাকে কোনো ব্যক্তির আচরণের চালিকাশক্তি বলা হয় কেন?
৩. প্রেষণা চক্র কী?
৪. প্রেষণা চক্রটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও।
৫. প্রেষণার স্তর কয়টি?
৬. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. SWOT কী?
২. প্রেষণা চক্র বলতে কী বোঝায়?
৩. কৃতিত্বার্জন প্রেষণা তত্ত্ব আলোচনা করো।
৪. প্রেষণার স্তর কয়টি ও কী কী উল্লেখ করো।
৫. SWOT বিশ্লেষণ কৌশলটি আলোচনা করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসায় উদ্যোগে প্রেষণার গুরুত্ব আলোচনা করো।
২. প্রেষণা চক্র চিত্রসহ বর্ণনা করো।
৩. SWOT বিশ্লেষণ করো।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি

Method of Starting Business

ভূমিকাঃ (Introduction) ব্যবসা শুরুর প্রথমেই একটি প্রকল্প নির্বাচন করতে হবে। সঠিক প্রকল্প নির্বাচনের পর ব্যবসা শুরু করার জন্য বেশ কিছু করণীয় কাজ রয়েছে। এ সকল করণীয় কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি সঠিক প্রকল্প হিসেবে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে নির্বাচন করা হলো। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি ব্যবসা হিসেবে চালু করার আগে যেমন কোনো স্থানে স্টোরটি স্থাপন করা হবে, তার ব্যবস্থাপনার ধরন কেমন হবে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা কত হবে, তাদের যোগ্যতা কেমন হবে, আইনগতভাবে তার অবস্থান কেমন হবে, সে সম্পর্কে আগেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠন করতে হবে। ব্যবসা শুরুর আগেই ব্যবসা সম্পর্কে একটি সুগঠিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ের প্রকৃতি, কতটুকু পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হবে, কীভাবে বাজারজাত করা হবে, ব্যবস্থাপনার ধরণ কেমন হবে, প্রাথমিক অর্থসংস্থান কীভাবে হবে এবং লাভ-ক্ষতি কেমন হবে ইত্যাদি সবকিছু ব্যবসা শুরুর পূর্বে নির্ধারণ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যত সুন্দর ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করা যাবে ব্যবসায় তত বেশি সাফল্য লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

৫.১ ব্যবসার ধরণসমূহ (Types of Business)

জীবিকা অর্জনের জন্য যারা ব্যবসা করে তাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সবাই একই ধরণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত নয়। তাদের কেউ শুধু পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে, কেউ পণ্যদ্রব্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে, আবার কেউ গ্রাহকের কোনো জিনিস মেরামত করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ধরণ অনুযায়ী ব্যবসাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : যথা :

১. ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসা

২. সেবামূলক ব্যবসা

৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা

নিম্নে ব্যবসার ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসাঃ তৈরি পণ্য উৎপাদক, পাইকার বা অন্য কোনো মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য কিনে এনে ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করার মধ্যে সীমিত ব্যবসাকে ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসা বলে। এক্ষেত্রে পণ্যের গুণ বা আকৃতিগত কোনো পরিবর্তন করা হয় না। এ জাতীয় ব্যবসায়ের উদাহরণ মুদি দোকান, ওষুধের দোকান, কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যবসা খুচরা বা পাইকারি উভয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

২. সেবামূলক ব্যবসা: পণ্য বা দ্রব্যের গুণ পরিবর্তন করে কিংবা অন্য কোনো ধরনের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় উপার্জনে নিয়োজিত ব্যবসাকে সেবামূলক ব্যবসা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন টেলিভিশন বা রেডিও মেকানিক একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া টেলিভিশন বা রেডিওকে তার কারিগরি জ্ঞান ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেরামত করে। এজন্য অনেক সময় তার টুলস এবং যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয় যা সে নিজেই সরবরাহ করে। এ কাজের বিনিময়ে সে পারিশ্রমিক পায়। এক্ষেত্রে তার কাজটি সেবামূলক ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন, ট্রাভেল এজেন্সি, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি সেবামূলক ব্যবসায়ের অন্তর্গত।

৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা: যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্যে কাঁচামালের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করে নতুন পণ্য তৈরি করার কাজে নিয়োজিত ব্যবসাকে উৎপাদনমূলক ব্যবসা বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ে কাঁচামালকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন করে উৎপাদিত পণ্য হিসেবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। যেমন– কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি, গম থেকে আটা, এমএস শিট থেকে আলমারি তৈরি, প্লাস্টিক দানা থেকে বলপেন তৈরি ইত্যাদি। উৎপাদনমূলক ব্যবসাকে শিল্প নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসার প্রকৃতি মূলত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কার্যাবলির উপরই নির্ভরশীল।

ব্যবসায় সাংগঠনিক কাঠামো:

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছোট বা বড় আকারের হতে পারে। ব্যবসার জন্য যেসব আইনানুগ সাংগঠনিক কাঠামো সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয় সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. একমালিকানা ব্যবসা
২. অংশীদারি ব্যবসা
৩. যৌথ মূলধনী ব্যবসা
৪. সমবায় সমিতি
৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসা

১. একমালিকানা ব্যবসা

একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসা বলে।
ব্যাপক অর্থে একমালিকানা ব্যবসা হলো এমন এক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যার মালিক, পরিচালক, সংগঠক ও পুঁজি সরবরাহকারী একজন মাত্র ব্যক্তি যিনি এককভাবে সকল ঝুঁকি বহন করেন এবং সমুদয় মুনাফা ভোগ করেন। গ্লেস ও বেকার-এর মতে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একক ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যবসায়ই হলো একমালিকানা ব্যবসা। ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে জনপ্রিয়। আমাদের দেশে মুদি দোকান, কনফেকশনারি, রেস্তোরা এবং যাবতীয় খুচরা দোকান একমালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

২. অংশীদারি ব্যবসা (Partnership Business)

সাধারণ অর্থে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কারবার গঠন ও পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করলে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে ।

ব্যাপক অর্থে: কমপক্ষে দুজন এবং সর্বোচ্চ বিশজন (ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ জন) ব্যক্তি মুনাফা অর্জন ও তা নিজেদের মধ্যে বন্টনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে ।

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় অংশীদারি ব্যবসার নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের নিমিত্তে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারি, যারা এরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদের প্রত্যেককে অংশীদার এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ব্যবসাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে ।'

৩। যৌথ মূলধনি ব্যবসা (Joint Venture Business)

সাধারণ অর্থে কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসা গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে যৌথ মূলধনি ব্যবসা বলে ।

ব্যাপক অর্থে কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করলে তাকে যৌথ মূলধনি ব্যবসায় বলে ।

১. ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায় ।

কোম্পানির মোট মূলধনকে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয় ।তার এক একটি অংশকে শেয়ার বলে । শেয়ার ক্রেতারাই কোম্পানির মালিক । যৌথ মূলধনি কোম্পানি দুই প্রকারের । যথা-

i. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

ii. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

৪. সমবায় সমিতি (Co-operative Societies)

সাধারণ অর্থে নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সমবায় সমিতি বলে ।

ব্যাপক অর্থে সমাজের স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংগঠন গড়ে তুলে তাকে সমবায় সমিতি বলে ।

মি. হেনরি কালভার্ট-এর মতে, 'সমবায় হলো এমন একটি সংগঠন যাতে সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে একত্রিত হয় ।'

সমাজের বিত্তহীন বা একই পেশাভুক্ত ব্যক্তিরা পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। সমবায় সমিতিতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্য থাকে। একজন সদস্য একাধিক শেয়ার ক্রয় করতে পারে কিন্তু একটি বেশি ভোট দিতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমান ২০০১ সালের সমবায় আইন ও ২০০৪ সালের সমবায় সমিতি বিধিমালার আওতায় এরূপ সমিতি গঠন ও পরিচালনা করতে হয়।

৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবসা (State business)

রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত বা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব ও মালিকানা সরকারের অধীনে থাকলে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা বলে। এ ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ করা, স্বয়ং রাষ্ট্রই এ ব্যবসার মালিক। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক এ ধরনের ব্যবসা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জাতীয় সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে এরূপ ব্যবসার সৃষ্টি হয়। মোট কথা, জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা গড়ে ওঠে। যেমন– ডেসকো, ওয়াপদা, বিটিসিএল, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, সার কারখানা ইত্যাদি।

৫.২ ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয়সমূহ

ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয় বলতে এরূপ বিষয়কে বোঝানো হয় যার আলোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হয়। অর্থাৎ যে বিশেষ বিচার্য বিষয়সমূহ ব্যবসা পরিচালনা করার প্রাথমিক স্তরেই বিবেচনা করতে হয় তাকে ব্যবসা শুরুর প্রাথমিক বিচার্য বিষয় বলে।

১। ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan)

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য একজন উদ্যোক্তার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অনেকেই ব্যবসা পরিকল্পনাকে ব্যবসার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ভিত্তি বা আয়না বলে থাকেন। সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট ব্যবসায় পরিকল্পনা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। ব্যবসা পরিকল্পনা হলো ব্যবসা পরিচালনার পথচিত্র, যা অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করলে ব্যবসার উন্নতি ও অবনতি পরিমাপ করা হয়। মোট কথা, ব্যবসায় পরিকল্পনা হলো একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসেবে তুমি কী করতে চাও এবং তোমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কীভাবে তুমি তোমার সম্পদ কাজে লাগাবে তার লিখিত বিবরণী বিশেষ।

২। ব্যবসার ধরন ও পরিধি

৩। প্রয়োজনীয় সংগঠন

৪। স্থান

৫.৩ ব্যবসা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে যে সকল বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. পরিবহন ও যাতায়াতের সুবিধা (Transport and Traffic Facility): ব্যবসার সফলতা উন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। এজন্য এর অবস্থান নির্বাচনে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্যবসার অবস্থান কেন্দ্রের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানের পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হলে একদিকে ক্রেতারা সহজেই ঐ স্থানে আগমন করতে পারে অপরদিকে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য পরিবহন ও যাতায়াত সুবিধার কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা গড়ে উঠেছে।

২. ব্যবসার প্রকৃতি (Nature of Business): ব্যবসার অবস্থান নিরূপণের জন্য এর প্রকৃতি বিবেচনা করা হয়। এজন্য দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা সংগঠন ভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে। যেমন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলে গড়ে উঠলেও ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামের যে কোনো সুবিধামতো স্থানে গড়ে ওঠে।

৩. গুদামজাতকরণ সুবিধা (Ware Housing Facility): ব্যবসায়ী ক্রেতা বা ভোক্তাদের উদ্দেশে উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীর কাছ থেকে একসাথে ব্যাপক পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে আনে। এজন্য তাকে গুদামজাত করে রাখতে হয়। তাই দেখা যায় বিভিন্ন শহর, বন্দর ও বাজার এলাকার আশপাশে প্রচুর গুদাম ঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যবসায়ীগণ তাদের পণ্য সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এ সকল স্থানকে ব্যবসার অবস্থান হিসাবে বিবেচনায় আনে।

৪. কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Raw Materials): পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবস্থান নির্বাচনের জন্য কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনা হয়। কারণ কাঁচামাল উৎপাদন এলাকায় গড়ে উঠলে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ চা উৎপাদন অঞ্চলে চা শিল্প, ইক্ষু উৎপাদন অঞ্চলের আশপাশে চিনিশিল্প প্রভৃতি ব্যবসা গড়ে ওঠে।

৫. শ্রমশক্তির সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Manpower): যে সমস্ত ব্যবসায় প্রচুর শ্রমশক্তি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর অবস্থান নির্বাচনে শ্রমিক কর্মীর সহজপ্রাপ্যতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। কারণ শ্রমশক্তির সহজপ্রাপ্যতার কারণে আমাদের দেশে বহু বিদেশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন– বাটা কোম্পানি। তাছাড়া আমাদের দেশে সস্তায় এবং সহজে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বিধায় এখানে অনেক গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে।

৬. জ্বালানি শক্তির সহজপ্রাপ্যতা (Availability of Fuel): ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে জ্বালানি শক্তির সহজপ্রাপ্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে সহজে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা প্রভৃতি সহজে পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৭. ক্রেতাদের অবস্থান (Standard of Customer): ক্রেতাদের মান, রুচি ও চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসার অবস্থানগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

৮. জমির মূল্য (Value of Land): বর্তমানে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে প্রস্তাবিত ব্যবসার প্রয়োজনীয় জমির মূল্যকে বিবেচনায় আনা হয়। যেখানে উঁচু জমি বন্যামুক্ত সস্তায় পাওয়া যায় সেখানে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৯. বাজারের সংলগ্ন (Adjacent of Market): ব্যবসার অবস্থান সাধারণত বাজার এলাকায় গড়ে ওঠে। কারণ ব্যবসা মূলত বাজারকেন্দ্রিক। এজন্য ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে পণ্যের বাজার এলাকাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

১০. মূলধনের পরিমাণ (Amount of Capital): ব্যবসার উদ্যোক্তা কী পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করতে পারবে তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করতে হয়। অধিক পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে পারলে এবং তা যদি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হয় তবে শহর এলাকায় বিবেচনায় আনতে হয়। অন্যথায় মূলধন স্বল্প হলে এবং তা যদি ক্ষুদ্রায়তন হয় সেক্ষেত্রে সুবিধামতো যে কোনো স্থানে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করা যায়।

১১. ভাড়া অগ্রিম (Rent Advance) : অনেক সময় ব্যবসায়ীকে একসাথে প্রচুর টাকা অগ্রিম দিয়ে একটি নির্ধারিত ভাড়া চুক্তিতে ব্যবসার স্থান নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর পক্ষে টাকা সরবরাহ দেওয়ার সামর্থ্য কতটুকু সে বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করা হয়।

১২. সহযোগী ব্যবসার উপস্থিতি (Existance of Subsidiary Business): ব্যবসায়ের সফলতা অর্জনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়। আর এজন্য দেখা যায় শিল্প কারখানার পাশে খুচরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও মেরামত কারখানার ব্যবসা গড়ে ওঠে।

১৩. সম্প্রসারণের সুযোগ (Facility of Expansion) : ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা কতটুকু তা বিবেচনা করতে হয়। ভবিষ্যতে ব্যবসায়ের উন্নতির সাথে সাথে যেন এর সম্প্রসারণ করা যায় সে দিক লক্ষ্য রেখে ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন করতে হয়।

১৪. অন্যান্য বিষয় (Other Factors): ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা, বাজারজাতকরণ সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা, ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদির নৈকট্য প্রভৃতি সুবিধামতো অবস্থানে নির্বাচন করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসার অবস্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ব্যবসার অবস্থান নির্বাচনের উপর ব্যবসার সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই ব্যবসার ধরণ অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক অবস্থান নির্বাচন করতে হবে।

৫.৪ ব্যবসা স্থাপনে :

সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ (Areas of cooperation)

একটি শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে অনেক ধরনের সহায়তার প্রয়োজন। এসব সহায়তা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সফলভাবে পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কোনো শিল্পোদ্যোক্তাকে যে সাহায্য সহযোগিতা করা হয় তাকে সহায়তার উৎস বলে।

সহায়তার ক্ষেত্রসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: উদ্দীপনামূলক সহায়তা, সমর্থনমূলক সহায়তা, সংরক্ষণমূলক সহায়তা।

সহায়তার ক্ষেত্রসমূহ (Types Areas of cooperation)

যে কোনো দেশের শিল্পায়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ উদ্যোক্তার কার্যকলাপ দেশের শিল্পের উন্নয়নের সহায়ক। শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা ও ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিগত ধরন অনুযায়ী এদেরকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

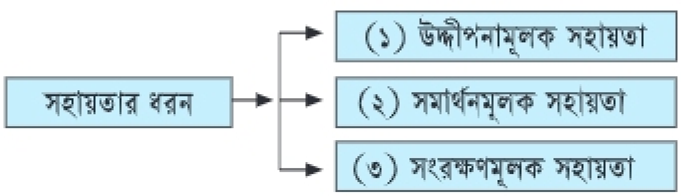

চিত্র-৭: সহায়তার ক্ষেত্রসমূহ

১। উদ্দীপনামূলক সহায়তা (Stimulatory Assistance)

উদ্দীপনামূলক সহায়তা বলতে ঐ সকল কর্মতৎপরতাকে বোঝায় যা একজন সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে শিল্প স্থাপনে অনুপ্রেরণা জোগায়। শিল্প বা ব্যবসা স্থাপন করা একটি সৃজনশীল, গঠনমূলক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যে কারণে অনেকেই এ কাজে এগিয়ে আসতে চায় না। অর্থাৎ ঝুঁকি গ্রহণ করতে রাজি হয় না। যদি কোনো ব্যক্তিকে একথাটি ভালোভাবে বোঝানো যায় যে, বেতন বা মজুরিভিত্তিক পেশার চেয়ে অধিক লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা হচ্ছে ব্যবসায়। তাহলে সে ব্যক্তি হয়তো ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত হবে। উদ্দীপনামূলক সহায়তার উপাদানগুলো হলো– (ক) উদ্যোগ গ্রহণমূলক শিক্ষা (খ) অনুপ্রেরণামূলক প্রশিক্ষণ (গ) বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা (ঘ) শিল্প স্থাপনে সরকারি সাহায্য-সহায়তার ব্যাপক প্রচার (ঙ) প্রকল্প প্রণয়ন ও নির্বাচনে সাহায্য ও পরামর্শ দান (চ) কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা (ছ) প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দেওয়া (জ) নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা ফোরাম গঠন ইত্যাদি।

২০২৪

২। সমর্থনমূলক সহায়তা (Supportive Assistance)

শিল্প বা ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য সমর্থনমূলক সহায়তা প্রয়োজন হয়। সমর্থনমূলক সহায়তা একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আরও বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে।

সমর্থনমূলক সহায়তাসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণ বা রেজিস্ট্রিকরণ
(খ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা
(গ) স্থায়ী ও চলতি মূলধনের সংস্থান
(ঘ) শিল্পের অবকাঠামোগত সহায়তা
(ঙ) মেশিনারি নির্বাচন ও সংগ্রহে সাহায্য
(চ) কাঁচামাল সংগ্রহে সহায়তা
(ছ) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পরামর্শ দান
(জ) কর অবকাশ ও ভর্তুকি প্রদান
(ঝ) পণ্য বাজারজাতকরণে সাহায্য ইত্যাদি।

৩। সংরক্ষণমূলক সহায়তা (Sustaining Assistance)

উদ্যোক্তা কর্তৃক শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও তাকে উৎপাদান কার্য অব্যাহত গতিতে চালিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে সকল সহায়তার প্রয়োজন হয় সেগুলোকে সংরক্ষণমূলক সহায়তা বলে।

সংরক্ষণমূলক সহায়তার প্রকৃতি নিম্নরূপঃ

(ক) শিল্প ও ব্যবসায়ের আধুনিকীকরণ
(খ) নতুন কলাকৌশল ব্যবহার
(গ) ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা
(ঘ) পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সহায়তা
(ঙ) শিল্প সম্প্রসারণে পরামর্শ দান
(চ) উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত অর্থসংস্থান
(ছ) ঋণের সুযোগ সৃষ্টি
(জ) পণ্য বিপণনের নতুন নতুন পন্থা সৃষ্টি ইত্যাদি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

৫.৫ আর্থিক সহায়তা গ্রহণের উৎসসমূহ

সহায়তার উৎসসমূহ (Source of Assitance)

বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত রয়েছে। যেগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিল্পায়নে সহায়তাকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-(১) সরকারি সহায়তাকারী উৎস (২) বেসরকারি সহায়তাকারী উৎস।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে সহায়তার উৎসমূহ দেখানো হলো:

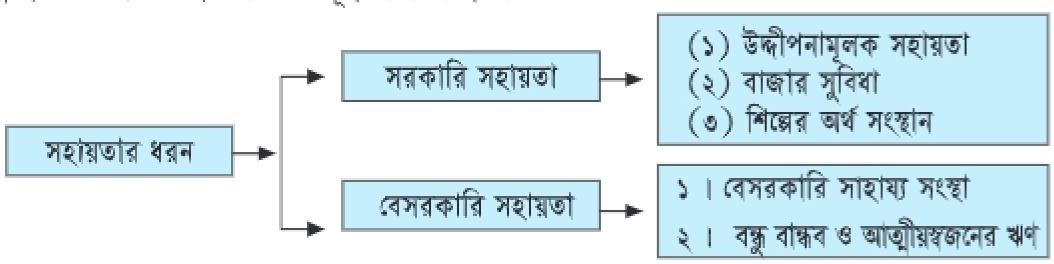

চিত্র-৮: সহায়তার উৎসমূহ

৫.৬ ব্যবসায় সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যাবলী

১। সরকারি সহায়তা (Government Assitance): ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প স্থাপনে সরকারিভাবে যে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়ে থাকে তাকে সরকারি সাহায্য-সহায়তা বলে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে সরকারি উৎসসমূহ শিল্পোদ্যোগ সহায়তার মূল উৎস হিসেবে পরিগণিত। কারণ দ্রুত শিল্পায়ন সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অন্যতম ক্ষেত্র। সরকার দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যেমন– শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি, রাজস্ব নীতি, রপ্তানি নীতি, বিভিন্ন অবকাঠামোগত সুবিধাদানের নীতি ইত্যাদি। নিম্নে সরকারি সহায়তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

(ক) শিল্পনীতি: সরকার দ্রুত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি ঘোষণার মাধ্যমে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার দিক নির্দেশ করে থাকে। শিল্পায়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় শিল্পনীতির সংশোধন ও পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করা হয়। একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) রাজস্ব সুবিধা: ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তার জন্য সরকার বিভিন্ন রাজস্ব সুবিধা দিয়ে থাকে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(i) কর অবকাশ: উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপন করা হলে যথাক্রমে পাঁচ বছর, সাত বছর এবং নয় বছরের কর অবকাশ থাকে। এরূপ অবকাশ উৎপাদন শুরুর মাস থেকে গণনা করা হয়। এছাড়া মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পশুর খামারে দশ বছরের কর অবকাশ দেওয়া হয়।

১০১৪

(ii) বর্ধিত হারে অবচয় ধার্যের সুযোগঃ নতুন মেশিনারি ও প্ল্যান্টের বেলায় প্রথম বছর শতকরা ৮০ ভাগ দ্বিতীয় বছর শতকরা ২০ ভাগ অবচয় ধার্য করার সুযোগ রয়েছে।

(iii) বিনিয়োগ ভাতাঃ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের মেশিনারী ও প্ল্যান্টের প্রকৃত মূল্যের শতকরা ২০-২৫ ভাগ বিনিয়োগ ভাতা দেওয়া হয়।

(গ) শিল্পে অর্থসংস্থানঃ সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের শিল্পায়নে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থা নিয়েছে।

(ঘ) শিল্পায়নে সাহায্যকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহঃ কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সাফল্যজনকভাবে পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদের নানাবিধ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে শিল্পায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

(ঙ)। **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC):** বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে উন্নত ও সাহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ সংস্থার প্রধান কাজ হলো এ শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পূর্বে পরামর্শ দান। এ সংস্থার অন্য কার্যগুলো নিম্নরূপঃ

(i) শিল্পসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ
(ii) উদ্যোক্তা শনাক্তকরণ
(iii) সাহায্যমূলক সেবা
(iv) শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন,
(v) প্রকল্প নির্বাচন,
(vi) প্রকল্প মূল্যায়ন
(vii) সম্ভাব্যতা পরীক্ষা
(viii) ঋণ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান
(ix) অবকাঠামোগত উন্নয়ন
(x) ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন
(xi) পণ্য ডিজাইন
(xii) কাঁচামাল সরবরাহে সাহায্য
(xiii) উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিপণনে সহায়তা
(xiv) গবেষণা ও উন্নয়ন
(xv) পণ্যের বাজার সমীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রবিশেষে এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে সংস্থার সাহায্যসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপন করেছে।

(চ)। **বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (BSB):** ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির নির্দেশে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় । এর অনুমোদিত মূলধন ২০০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৩২ কোটি টাকা । বাংলাদেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন শিল্প প্রকল্প স্থাপন এবং চালু শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ,

আধুনিকীকরণ, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণের জন্য শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ-প্রদান ও পরামর্শ দেওয়া শিল্প ব্যাংকের প্রধান কাজ ।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে এবং ব্যাংকের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সীমিত পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি চলতি মূলধন সরবরাহ করে । এছাড়া সীমিত পরিমাণে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিসমূহের শেয়ার সরাসরি ক্রয়ের মাধ্যমে ইকুইটি সমর্থন দান, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোর শেয়ার জনসাধারণের কাছে বিক্রয়ের জন্য অবলিখন (Underwriting) এবং এ ধরনের কোম্পানিগুলোর জন্য স্বল্পমেয়াদি সম্পূরক অর্থ জোগানের ব্যবস্থা করে । ব্যাংক বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং প্রকল্প নির্বাচনে, বাস্তবায়নে ও পরিচালনায় বিনিয়োগকারীকে বিনামূল্যে কারিগরি পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে ।

(ছ)। **বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (BSRS):** শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি, শিল্প সম্পর্কিত সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় । বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার কাজ হচ্ছে ঋণ আদায়ের সামগ্রিক অবস্থা তথা ঋণগ্রহীতাদের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষজ্ঞমূলক ভূমিকার উন্নয়ন। সংস্থার নিজস্ব পোর্টফলিওভুক্ত শিল্প প্রকল্পগুলোর সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ, অনুন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা। শিল্পায়ন, গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত পরামর্শ দান।

(জ)। **ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB):** এটি বাংলাদেশের একমাত্র বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান । ১৯৭৬ সালের পহেলো অক্টোবর বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান, বিনিয়োগের সম্প্রসারণ, পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাহায্য প্রদান, সঞ্চয়কে অর্থকরী কাজে লাগানো ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ।

প্রতিষ্ঠার সময় হতেই আইসিবি সাধারণ সীমিত কোম্পানির বৈশিষ্ট্য অধিকারী প্রকল্পসমূহে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাই ও বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক নির্ধারণের প্রেক্ষিতে অবলিখন ও ঋণপত্র (Debenture) ঋণের যাচাইয়ে সহায়তা করে আসছে । আইসিবি-এর কার্যাবলি সম্পাদনের সময় বাণিজ্যিক দিক ছাড়াও পুঁজিবাজার, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের দিক বিবেচনা করে থাকে । বিনিয়োগ ঝুঁকি দূর করার জন্য আইসিবির নেতৃত্বে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা হয়েছে ।

(ঝ)। **বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank):** শিল্প ও ব্যবসায়ে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যথা- সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের মাধ্যমে সর্বস্তরের শিল্পোদ্যোক্তাদের

ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া ব্যাংকিং সেবাকে আরও ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব ব্যাংক শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো দীর্ঘমেয়াদি পুঁজিও সরবরাহ করছে। একজন শিল্পোদ্যোক্তা মূলধন ছাড়াও ব্যাংক থেকে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিনিয়োগ-পূর্ব পরামর্শ, পণ্য নির্বাচন এবং বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারে।

(ঞ)। **আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক (CIE):** শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করতে একজন উদ্যোক্তাকে মেশিনারী, কাঁচামাল এবং খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে হয়। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোকে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করার পূর্বে সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রক বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার লাইসেন্স এবং রপ্তানিকারককে রপ্তানি নিবন্ধন সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে।

(ট)। **বাংলাদেশ হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্য রপ্তানি কর্পোরেশন (BHPECO):** এ কর্পোরেশনের প্রধান লক্ষ্য হস্তচালিত তাঁতশিল্প দ্রব্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের তাঁত ও কুটির শিল্পের পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তাঁত শিল্প দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

(ঠ)। **বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সাহায্য সংস্থা (BITAC):** দেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কেন্দ্রের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন ডিজাইন ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত করা, যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে উপদেশ প্রদান, বিভিন্ন প্রকাশনা, সেমিনার, গ্রুপ আলোচনা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান দান ইত্যাদি।

(ড)। **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR):** এ পরিষদ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণার দিক নির্দেশ, নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন ও পরিষদের বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের বাস্তব প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া এটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সেল স্থাপনে উৎসাহিত করে। দেশীয় প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া উন্নয়ন এবং শিল্প ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করাও পরিষদের অন্যতম কাজ। একজন শিল্পোদ্যোক্তা এ পরিষদের আবিষ্কৃত পণ্য বা প্রক্রিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

(ণ)। **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি (আইডিএলসি):** দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য লিজিং কোম্পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আইডিএলসি ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সাহায্য করছে।

(ত)। **শিল্প ও বণিক সমিতি:** শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্যের উন্নয়নে ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যবসায় শিল্প ও বণিক সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন সমিতি তাদের ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করে। ব্যবসায় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন, সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি এ সমিতির কাজ। এসব সমিতির মধ্যে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বারস অব কমার্স (এমসিসি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (নাসিব) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(থ)। **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব):** এ দুটি ব্যাংক কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ও কুটির শিল্পসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। সারা দেশে এদের অনেক শাখা রয়েছে।

(দ)। **এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (ইপিবি):** বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইপিবি শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে। এসব সাহায্যের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশি পণ্যের প্রচার, বিদেশি আমদানিকারকের সাথে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকের যোগাযোগ স্থাপন, রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান, অল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, রপ্তানিকারকের বিদেশ সফরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান এবং এক্সপোর্ট গ্যারান্টি প্রদান।

(ধ)। **ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি):** এ করপোরেশন শিল্পোদ্যোক্তাদের কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে সাহায্য করে। এছাড়া কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদিত পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(ন)। **বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (BSTI):** এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা যাতে দেশি ও বিদেশি বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে। বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য দেশি ও বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য অর্জনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এ সংস্থা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

(প)। **বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) ও রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (আরইবি):**

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

(ফ)। **বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম):** শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপক সরবরাহের জন্য এ সংস্থা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। এসব কোর্সে শিল্পোদ্যোক্তা নিজে বা তার ফার্মের ব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

অধিকন্তু শিল্প ও বাণিজ্য খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কারিগরি জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ/প্রকৌশলী সরবরাহ করার লক্ষ্যে দেশের শিল্প ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট সরকারি খাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। **বেসরকারি সহায়তা (Non Government Assistance):** কোনো শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উৎসাহ বা সহায়তা বেসরকারি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। বর্তমান শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার চেয়ে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা (এনজিও) উপদেষ্টা ফার্ম, ব্যবসায় বা বণিক সমিতি থেকে শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা নিতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে বেসরকারি উৎস উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বেসরকারি সহায়তার উৎসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

(ক) বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ: ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানের একটি স্বীকৃত উপায় বা উৎস হিসেবে আমাদের সমাজে পূর্বকাল থেকেই বিবেচিত হয়ে আসছে, আত্মীয়স্বজনও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করা।

(খ) বেসরকারি সাহায্য সংস্থা: বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থাগুলো উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন–গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা প্রভৃতি সংস্থা আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও কুটির শিল্প স্থাপনে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে থাকে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্থার কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো :

১।গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank)

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক নামকরণের মাধ্যমে একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেন। পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পকে বিত্তহীনদের জন্য একটি বিশেষ ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। সাধারণত বিত্তহীনদের ৫ বা ১০ জনের একটি দলকে একত্র করে এ ব্যাংক কোনো বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবল একজনকে পৃথকভাবে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। মাথাপিছু গড় ঋণ ২ থেকে ৩ হাজারের বেশি হয় না। ঋণের টাকা সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে লাভজনক ব্যবসায় বা ক্ষুদ্র শিল্পে খাটাতে পারে।গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানেও উদ্বুদ্ধ করে।

২।ব্র্যাক (Bangladesh Rural Advancement Committee)

ব্র্যাক সর্ববৃহৎ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নিয়ে সংস্থাটি স্থাপিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে দারিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এ সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষে ব্র্যাক যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে–

ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম: এর মধ্যে রয়েছে কাপড় বুনন, হাঁস-মুরগি পালন, আসবাবপত্র, তৈল উৎপাদন, গুড়, দড়ি, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি, ধান ভানা প্রভৃতি।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন: এ কর্মসূচির আওতায় ভূমিহীন লোকদের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। যথা– ইট তৈরি প্রকল্প।

উৎপাদন কেন্দ্র উন্নয়ন: আধুনিক ডিজাইন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পজাত সামগ্রীর মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। ঐতিহ্যগত কারুশিল্পের উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে সিল্ক, জামদানি, নকশিকাঁথা প্রভৃতি।

৩। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ: দেশি-বিদেশি ব্যাংক মিলে বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারি খাতে অনেক ব্যাংক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এসব ব্যাংকের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাংক লি., ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি., আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক, গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক, ইন্দোসুয়েজ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এ বি ব্যাংক লি., ঢাকা ব্যাংক লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. প্রভৃতি। শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান এসব ব্যাংকের অন্যতম কাজ। এসব ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যও সম্পাদন করে।

৪। **বীমা** কোম্পানি: সাধারণ বীমা করপোরেশন ও জীবন বীমা করপোরেশন দুটি সরকারি বিমা কোম্পানির পাশাপাশি বেসরকরি খাতে বেশ কয়েকটি বিমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এদের মধ্যে ইস্টার্ন ইনসিউরেন্স, ইস্টল্যান্ড ইনসিউরেন্স, গ্রীনল্যান্ড ইনসিউরেন্স ও প্রগতি ইনসিউরেন্স প্রধান। এছাড়াও কিছু সংখ্যক বিদেশি ইনসিউরেন্স কোম্পানিও বাংলাদেশে বিমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছে।

৫.৭ ব্যবসা পরিচালনায় বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ধারণা

ব্যবসায় আইনগত দিক (Legal Aspects of Business)

মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য যেসব বৈধ পেশা রয়েছে তার মধ্যে ব্যবসা অন্যতম। যে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই চাকরির পরিবর্তে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে ব্যবসা করতে পারে। এতে আইনের কোনো বাধা নিষেধ নেই। তবে প্রতিটি দেশের সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ণ করে থাকে। কাজেই ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনাসংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ব্যবসায় উদ্যোক্তার জ্ঞান থাকা ব্যবসায় সাফল্যের পূর্বশর্ত। বিভিন্ন ধরনের আইন দ্বারা ব্যবসার

কার্যাবলি প্রভাবিত হয়। যেমন– শ্রম ও শিল্প আইন, কারখানা আইন, ব্যবসায় সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন, নিম্নতম মজুরি আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, শিল্প বিরোধ আইন, শ্রমিক সংঘ আইন, দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন, মূল্য সংযোজন কর আইন ইত্যাদি।

প্রশ্নমালা-৫

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ধরণ অনুযায়ী ব্যবসায়কে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
২. সেবামূলক ব্যবসায় কাকে বলে?
৩. একমালিকানা ব্যবসায়ের নিবন্ধন কী বাধ্যতামূলক?
৪. অংশীদারি কারবারের ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কি?
৫. যৌথ মূলধনি কারবারের নিবন্ধন কি বাধ্যতামূলক?
৬. প্রকৃতিগত ধরন অনুযায়ী সহায়তার ধরনকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
৭. সমর্থনমূলক সহায়তা কী?
৮. একজন ব্যবসায়ীর সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয় কেন?
৯. সাহায্য-সহযোগিতার উৎস কত প্রকার ও কী কী?
১০. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার প্রধান কাজ কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দাও।
২. ব্যবসায়ের ধরন কত প্রকার ও কী কী?
৩. উৎপাদনমূলক ব্যবসা কাকে বলে?
৪. ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় ব্যবসা বলতে কী বোঝায়?
৫. অংশীদারি ব্যবসার সংজ্ঞা দাও।
৬. সমবায় সমিতি কাকে বলে?
৭. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সংজ্ঞা দাও।
৮. যৌথ মূলধনি ব্যবসার সংজ্ঞা দাও।
৯. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কাকে বলে?
১০. রাষ্ট্রীয় কারবার কাকে বলে?
১১. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ বলতে কী বোঝায়?
১২. সহায়তার উৎসসমূহ বলতে কী বোঝায়?
১৩. উদ্দীপনামূলক সহায়তা কাকে বলে?
১৪. সমর্থনমূলক সহায়তা কাকে বলে?
১৫. সংরক্ষণমূলক সাহায্য সহায়তা কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

Business Management

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে যে বিষয়টি সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন তা হলো ব্যবস্থাপনা। মানব সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপনের জন্য যেসব কার্য সম্পাদন করত সে থেকেই ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে ব্যবস্থাপনা একটি অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত। আজকাল ছোট-বড় সকল কারবারি, অকারবারি সকল প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিসরে যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অবশ্যই দক্ষ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য।

৬.১ ব্যবস্থাপনার ধারণা, সংজ্ঞা ও কার্যাবলি

ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

ব্যবস্থাপনা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। Management শব্দটি ইতালীয় শব্দ 'Maneggiare' হতে উদ্ভূত। Maneggiare শব্দের অর্থ 'To train up the horses' অর্থাৎ অশ্বকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে তোলা। তাই শাব্দিক অর্থে পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত (to handle) কাজকে ব্যবস্থাপনা বলে।

অনেক ব্যবস্থাপনাবিদ মনে করেন Management শব্দটি ফরাসি Manage এবং Menager শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। Manage শব্দের অর্থ হলো (The act of guiding or leading) অর্থাৎ পরিবার পরিচালনা করা।

সাধারণ অর্থে: প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের সুকৌশলে পরিচালনা করাকে ব্যবস্থাপনা বলে।

ব্যাপক অর্থে: প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদসমূহের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয় সাধন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলির সমাহারকে ব্যবস্থাপনা বলে।

নিম্নে প্রখ্যাত মনীষী ও ব্যবস্থাপনাবিদদের কতিপয় উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো:

১। আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেয়ল (Henry Fayol)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।'

২। এল.এ. এপলি (L.A Appley)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হলো অন্যের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল।' (Management is the art of getting things done through the efforts of other people)

৩। জর্জ. আর. টেরি (G.R. Terry)-এর মতে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন করে।

৪। ই.এফ.এল ব্রিচ (E.F.L Breach)-এর মতে, 'ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।'

৫। এল. এ. এলেন (L.A Allen)-এর মতে, 'একজন ব্যবস্থাপক যা করেন তাই ব্যবস্থাপনা। (Management is what a manager does)

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

Function of Management

ব্যবস্থাপনা বিশারদ চিন্তাধারা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি কে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হলো।

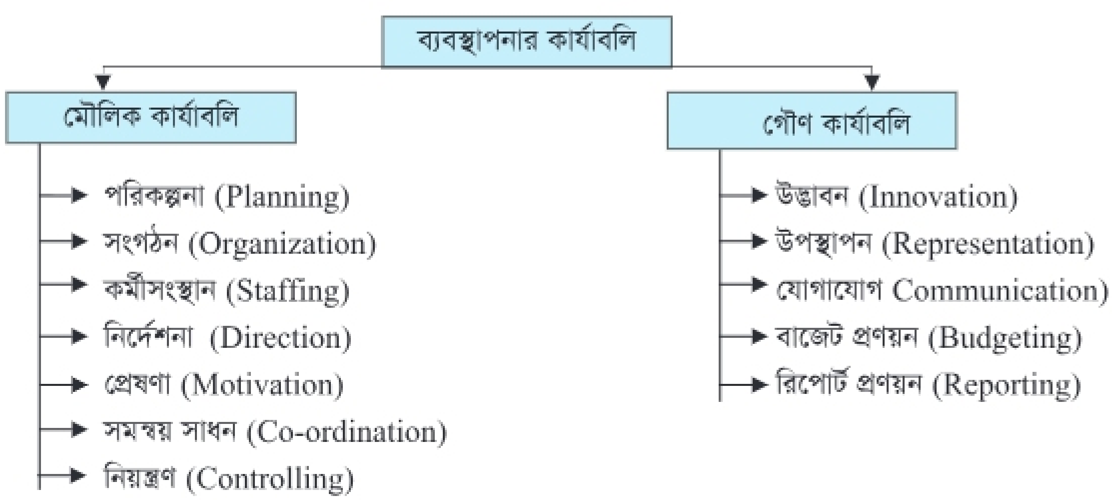

চিত্র-৯: ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি

নিম্নে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করা হলোঃ

১। পরিকল্পনা (Planning) : পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক কাজ। পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক-নির্দেশনা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী কাজ করা হবে, কে করবে, কখন করবে, কীভাবে করবে ইত্যাদি নির্ধারণ করাই হলো পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধ্যাপক নিউম্যান বলে, 'ভবিষ্যতে কী করতে হবে তার অগ্রিম সিদ্ধান্তকেই পরিকল্পনা বলে। মোটকথা প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত ভবিষ্যৎ নকশাকে পরিকল্পনা বলে।'

২। সংগঠন (Organization): পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপরিহার্য উপাদান হলো সংগঠন। পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংগৃহীত উপাদান ও জনশক্তির সুশৃঙ্খল বিন্যাসকে সংগঠন বলে। সংগঠন হচ্ছে একটি কাঠামো বিশেষ। যেখানে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করে দেওয়া হয়। এতে কর্মীরা সহজেই প্রতিষ্ঠানে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।

৩। কর্মীসংস্থান (Staffing): সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণের পর ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হলো বিভিন্ন স্তরে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী জোগাড় এবং তাদের যথাযথভাবে নিয়োগ দান করা। সুতরাং সাংগঠনিক কাঠামোতে মানব শক্তির অভাব পূরণের জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাকে কর্মীসংস্থান বলে।

৪। নির্দেশনা (Direction) : প্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মীদেরকে যে আদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয় তাকে নির্দেশনা বলে। নির্দেশনা প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। তাই একে প্রশাসনের হৃৎপিণ্ড বলা হয়।

৫। প্রেষণা (Motivation) : প্রেষণা ব্যবস্থাপনার একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক। যে প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থাপক শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি আকৃষ্ট, আগ্রহী এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে থাকেন, তাকে প্রেষণা বলা হয়। এর মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে কাজ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। মাইকেল জুসিয়াস-এর মতে, 'প্রেষণা হলো ব্যবস্থাপনা কর্তৃক সেই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ যা কর্মীদেরকে নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে।'

৬। সমন্বয় সাধন (Co-ordination): প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভাগ, উপকরণ ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াই হলো সমন্বয় সাধন। সমন্বয় সাধন দলগত সমঝোতার একটি মাধ্যম। সমন্বয় সাধনের ফলে সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর হয় এবং সকলে একযোগে ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়।

৭। নিয়ন্ত্রণ (Controlling): নিয়ন্ত্রণ হলো ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ কাজ। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে যথাস্থানে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ। হেনরি ফেয়ল-এর মতে, 'নিয়ন্ত্রণ হলো গৃহীত পরিকল্পনা, জারিকৃত নির্দেশনা ও প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী কার্য পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।'

২০২৪

৬.২ উৎপাদন, বাজারজাত ও কর্মী ব্যবস্থাপনা

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা (Production Management)

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা এ শব্দ দুটো নিয়ে গঠিত একটি যুগ্ম শব্দ। উৎপাদন অর্থ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করা। পক্ষান্তরে সর্বাধিক দক্ষতার সাথে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের অপরাপর লোকের মাধ্যমে কার্য-সম্পাদন করে নেওয়ার কলা ও বিজ্ঞানই হলো ব্যবস্থাপনা।

সাধারণ অর্থে উৎপাদন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বলা হয়।
ব্যাপক অর্থে কাঁচামালকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করার সমুদয় প্রক্রিয়ায় প্রয়োগকৃত পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সংবলিত সামগ্রিক কার্যক্রম হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা।

বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা (Marketing Management): ব্যবসায় সাফল্য অর্জনে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। উৎপাদিত পণ্যেও বাজারজাতকরণের উপরই ব্যবসার সাফল্য অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভরশীল। আধুনিক বাজারজাতকরণ একটি অত্যন্ত গতিশীল ক্ষেত্র।

সাধারণ অর্থে বাজারজাতকরণের সামগ্রিক কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ সম্পর্কিত ধারণাই বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা।
ব্যাপক অর্থে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা ভোক্তার কাছে সন্তোষজনকভাবে এবং সময়মতো পৌছে দেওয়ার কলাকৌশলকেই বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা বলে।

কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personal Management)

কর্মী ব্যবস্থাপনা হলো সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মুখ্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ অংশ। শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনানর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সে অংশ যা শ্রমিক কর্মীসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৬.৩ কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personal Management)

কর্মী ব্যবস্থাপনা বলতে এমন একটি কৌশলকে বোঝায় যা দিয়ে একটি দক্ষজনশক্তি সংগ্রহ উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে উক্ত সংগঠনের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে মিতব্যয়িতা ও অধিক কর্ম তৎপরতা সৃষ্টি হয়। কর্মী ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যাবলী সমূহ হচ্ছে

১। কর্মী পরিকল্পনা ২। কর্মী সংস্থা ৩। কর্মী নির্বাচন ৪। কর্মী সংগঠন

কর্মী পরিকল্পনা (Planning of Employ): একটি ব্যবসার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কত সংখ্যক কর্মী প্রয়োজন তা নির্বাচন, নিয়োগ, উন্নয়ন পারিশ্রমিক প্রভৃতি পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়াকেই কর্মী পরিকল্পনা বলে। ব্যবসার ধরণ, প্রকৃতি ও আয়তনের উপর কর্মী-সংখ্যা নির্ভর করে। যেমন একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। অপরদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া যন্ত্রপাতি চালিত হলে সেখানে কম সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। কর্মীর পারিশ্রমিক কীভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তা আগেই নির্ধারণ করা হয়, যা কর্মী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্মী সংগ্রহ (Source of Employ): ব্যবসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সংগ্রহ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার পরবর্তী কাজ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং কীভাবে সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণপূর্বক কর্মী সংগ্রহ করা হয়। কর্মী সংগ্রহের পূর্বে কোন পদে কতজন লোক নেওয়া হবে তা চিহ্নিত করতে হবে এবং উক্ত পদের জন্য কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে তাও নির্ধারণ করতে হবে। চিহ্নিত করার পরই কর্মী সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

কর্মী নির্বাচনের সংজ্ঞা (Definition of Selection of Employess)

সাধারণ অর্থে: কর্মী নির্বাচন বলতে শুধু নতুন কর্মী নিয়োগ করাকে বোঝায় না; কর্মীদের পদোন্নতি, পদাবনতি, বহিষ্কার বা ছাঁটাই প্রক্রিয়াও কর্মী নির্বাচনের অন্তর্ভুক্ত।

৬.৪ কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিসমূহ
The Procedures of Selection Employees

কর্মী নির্বাচনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন করে থাকে।

তবে বৃহদায়তন ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। বিভাগীয় রিকুইজিশন প্রাপ্তি: কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরুতে কোথায়, কতজন ও কী ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন তা শ্রমিক কর্মী বিভাগকে জানাতে হয়। বিভিন্ন বিভাগ হতে রিকুইজিশন পাওয়ার পর কর্মী নির্বাচনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

২। বিজ্ঞপ্তি প্রদান: শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ শূন্য পদ পূরণের জন্য দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়ে থাকে। দরখাস্তে প্রার্থীর পূর্ণনাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, জাতীয়তা, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ উল্লেখ থাকে।

৩। আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাই: বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রার্থীরা আবেদনপত্র জমা দেয়। আবেদনপত্র পাওয়ার পর তাতে ভুল আছে কিনা পরীক্ষা করে উপযুক্ত আবেদনপত্র বাছাই করে প্রার্থীর লিখিত বা সাক্ষাৎকার পরীক্ষার জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হয়।

৪। নিযুক্তি পরীক্ষা গ্রহণ: কর্মীদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ নেওয়া যেতে পারে:

(ক) লিখিত পরীক্ষা: লিখিত পরীক্ষায় অনেকগুলো অভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সাধারণ জ্ঞান যাচাই করা হয়। তাছাড়া প্রার্থীর হাতের লেখা এবং লিখন ক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায়।

(খ) মৌখিক পরীক্ষা: নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য নির্বাচন বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান করা হয়। এতে প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, আচার-আচরণ, বুদ্ধিমত্তা, প্রবণতা ইত্যাদি অবস্থা জানা যায়।

৫। প্রাথমিক ও সাময়িকভাবে নির্বাচন: উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে কোন প্রার্থী যোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাকে প্রাথমিক ও সাময়িকভাবে নির্বাচন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ নির্বাচনের সংবাদ প্রার্থীকে জানানো হয় না।

৬। স্বাস্থ্য পরীক্ষা: প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থীর দেহের ওজন, উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

৭। প্রার্থীর ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুসন্ধান: চূড়ান্ত নিয়োগদানের পূর্বে প্রার্থীর অতীত কার্যাবলি যেমন−চরিত্র, আচার-আচরণ, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুকূলে হলে চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হয়, অন্যথায় তালিকা হতে তার নাম বাদ দেওয়া হয়।

৮। নিয়োগপত্র প্রদান: প্রার্থী সকল পরীক্ষায় যোগ্য বিবেচিত হলে তাকে সাধারণত অস্থায়ীভাবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তার ঠিকানায় নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়। এতে চাকরিসংক্রান্ত শর্তাবলি ও কাজে যোগদানের সর্বশেষ তারিখের উল্লেখ থাকে।

৯। যোগদানের রিপোর্ট গ্রহণ: নিয়োগপত্রের আলোকে প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কর্মকর্তার কাছে যোগদানের রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করলে কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই উপরোক্ত পদ্ধতিতে কর্মী নির্বাচন করা হয়।

৬.৫ কর্মী উন্নয়ন: ব্যবসায় উন্নতিকল্পে কর্মীদের উন্নয়নের প্রয়োজন অপরিহার্য। কর্মীদের তাদের নির্ধারিত কাজে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে ব্যবসায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সফলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। আর কর্মীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই বৃদ্ধি করা যায়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে।

৬.৬ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম

মানব জীবনে যোগাযোগ একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বা তথ্য বিনিময় করে। ভাব বা তথ্যেও এ বিনিময় কার্যকেই যোগাযোগ বলে। দোলনা থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার প্রতিটি মুহূর্তে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। যোগাযোগ শুধু ব্যক্তিজীবনেই নয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর কার্যক্রম বিস্তৃত। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অচল।

যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমসমূহ (Media of Communication)

মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম বা কৌশলসমূহ: মানবজীবনের যোগাযোগ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মৌখিক যোগাযোগই সর্বপ্রথম প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। নিম্নে মৌখিক যোগাযোগের বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম বা কৌশলসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। কথোপকথন: কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া যোগাযোগকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয় তাকে কথোপকথন বলে। কথোপকথন মৌখিক যোগাযোগে ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত মাধ্যম। এ পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরক ও বার্তা প্রাপক উভয়েই খোলাখুলিভাবে মতবিনিময় করতে পারে।

২। সাক্ষাৎকার: বার্তা প্রেরক ও প্রাপক নির্দিষ্ট সময়ে একত্রে মিলিত হয়ে পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর আলাপ-আলোচনা করলে তাকে সাক্ষাৎকার বলে। এ পদ্ধতিতে সাক্ষাৎপ্রার্থী নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে তথ্যাদি আদান-প্রদান করে থাকে।

৩। টেলিফোন: মৌখিক যোগাযোগের একটি আধুনিকতম পদ্ধতি হলো টেলিফোন। ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হয়েও টেলিফোনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তে অবস্থিত ব্যক্তির সাথে অল্প সময়ে তথ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারেন।

৪। মঞ্চ বক্তৃতা: যে পদ্ধতিতে একযোগে বহুসংখ্যক জনতার উদ্দেশে মঞ্চে দাঁড়িয়ে যোগাযোগকারী বক্তব্য পেশ করে তাকে মঞ্চ বক্তৃতা বলে। তবে এরূপ যোগাযোগে পারস্পরিক মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ থাকে না।

৫। দলগত আলোচনা: মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দলগত আলোচনা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে দলগত আলোচনা। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে দলগত আলোচনার সুফল পাওয়া যায়। যেমন– প্রশিক্ষণ, মানব সম্পর্কে ধারণা যাচাই।

৬। সম্মেলন বা কনফারেন্স: এটি মৌখিক যোগাযোগের একটি অন্যতম কৌশল। সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো একটি দল আলাপ-আলোচনায় মিলিত হলে তাকে সম্মেলন বা কনফারেন্স বলে।

৭। টেলিভিশন ও বেতার: রেডিও-টেলিভিশনে কথিকা পাঠ করে যোগাযোগকারী তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে। এটি একটি একতরফা যোগাযোগ পদ্ধতি।

৮। চা-চক্র: মৌখিক যোগাযোগের একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি হলো চা-চক্র। এ যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ মাঝে মধ্যে চা-চক্রে মিলিত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন।

৯। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপায়ে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। ১০১৪

১০। কমিটি পর্যালোচনা: কমিটি পর্যালোচনা যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ মাধ্যম। এ মাধ্যমে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি সামনাসামনি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

১১। অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ: এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক অধীনস্থ কর্মীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কের খোঁজ-খবর পেতে পারে। এ ধরনের যোগাযোগ চায়ের টেবিলে, খেলার মাঠে স্থাপন করা সম্ভব।

১২। পারিবারিক সমস্যা: পারিবারিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করলে ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীগণ ঘরোয়া পরিবেশে মিলিত হয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন।

১৩। পুরস্কার বিতরণী সভা: এরূপ যোগাযোগ মাধ্যমে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীদের জন্য পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান করে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

১৪। সামাজিক অনুষ্ঠান: বিয়ে, বনভোজন, বিতর্ক, বার্ষিক প্রীতিভোজ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হলে নির্বাহী কর্মকর্তা ও অধস্তন কর্মীগণ মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। এতে উভয়ের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক মৌখিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে।

লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ

লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: যথা:

(ক) ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ।

(খ) কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ।

(ক) ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যম বা কৌশলসমূহ: প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, নির্বাহী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যোগাযোগের জন্য যে লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাকে ব্যবস্থাপনার জন্য লিখিত যোগাযোগ পদ্ধতি বলে। নিম্নে এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হলো:

১। সংগঠন সম্পকির্ত যোগাযোগ: সংগঠন সম্পর্কিত যোগাযোগ যেমন– সাধারণ ঘোষণা, নীতি, বিজ্ঞপ্তি, প্রশাসনিক নির্দেশনা ইত্যাদি যোগাযোগ লিখিত হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

২। জরুরি ব্যবস্থাপনা বুলেটিন: ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষ জরুরি বিবৃতি পরিবেশন এবং তা নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের কাছে পৌঁছাতে হলে লিখিত যোগাযোগ আবশ্যক।

৩। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন: প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তি তার উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে কার্য ধারায় যে লিখিত রিপোর্ট পেশ করে থাকেন তাকেই আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন বলে।

৪। ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চিঠি: সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম জরুরি বিষয়াদি চিঠির মাধ্যমে ব্যবস্থাপককে জানানোর পদ্ধতিকে ব্যবস্থাপনা সংবলিত চিঠি বলা হয়। এ ধরনের চিঠি সাধারণত সাপ্তাহিক খবরাখবর প্রকাশ করা হয়।

৫। তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশিকা পুস্তক: প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদের সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা পুস্তক সরবরাহ করা হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আইন-কানুন, রীতি-নীতি, ট্রেড ইউনিয়নের কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদি লিখিত থাকে।

৬। তত্ত্বাবধায়কের জন্য বিশেষ প্রকাশনা: অনেক সময় বড় বড় কোম্পানি তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধান কাজের সুবিধার জন্য বিশেষ প্রকাশনার ব্যবস্থা করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়,হ্রাস, পণ্যের মানোন্নয়ন, দুর্ঘটনা হ্রাস, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে।

(খ) কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ: প্রতিষ্ঠানের নিম্নস্তরে কর্মরত কর্মচারীদের কাছে লিখিত আকারে তথ্য প্রেরণ করার জন্য কতিপয় মাধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে কর্মচারীদের জন্য লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আলোচনা করা হলো:

১। কর্মচারী বুলেটিন: অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোনো জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ খবর কর্মচারীদের জানানোর জন্য লিখিতভাবে এ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়।

২। কর্মচারীদের সংবাদ: প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মচারীদেরকে জানানোর জন্য প্রতি সপ্তাহে লিখিত সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

৩। মাসিক পত্রিকা প্রকাশ: অনেক সময় বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এর কর্মচারীদেরকে সকল ব্যাপারে অবহিত করার জন্য নিজস্ব মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে।

৪। নতুন কর্মচারীদের কাছে পত্র: নবনিযুক্ত কর্মীদেরকে অভিনন্দন ও তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য স্বাগত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৫। কর্মচারীদের বাড়িতে পত্র প্রেরণ: কর্মচারীদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানানোর জন্য ব্যবস্থাপক সাধারণত পাক্ষিক বা মাসিক তাদের বাড়ির ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করে থাকে। তবে এতে কোনো প্রত্যুত্তর চাওয়া হয় না।

৬। বার্ষিক প্রতিবেদন: কর্মচারীদেরকে প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতা, বাৎসরিক আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানানোর জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

৭। অভিযোগ বই: প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের অভিযোগ লিখিতভাবে জানানোর জন্য প্রত্যেক বিভাগে যে বই সংরক্ষণ করা হয় তাকে অভিযোগ বহি বলে। এতে কর্মচারীরা তাদের সুবিধা-অসুবিধা, অভাবে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারে।

৮। নোটিশ বই: অধস্তন কর্মচারীদেরকে জরুরি ভিত্তিতে কোনো তথ্য অবগত করানোর জন্য নোটিশ বই ব্যবহার করা হয়।

২০২৪

৯। রচনা প্রতিযোগিতাঃ কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম অতিরিক্ত কৌশল হিসেবে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

১০। বেতন খামঃ অনেক সময় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, কর্তন, ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য ভাতা সম্পর্কিত তথ্য লিখিতভাবে বেতন খামের মাধ্যমে জানানো হয়।

১১। পাঠের তাকঃ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তাকের মধ্যে বইপত্র সাজিয়ে রাখা হয়। এ সমস্ত বইপত্র হতে কর্মচারীরা অবসর সময়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

১২। শ্রবণ দর্শন মাধ্যমঃ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের লিখিত যোগাযোগ সহযোগী বা পরিপূরক হিসেবে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে থাকে।

১৩। স্মারকপত্রঃ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ছুটি মঞ্জুর এবং চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় কর্মচারীদের জানানোর জন্য কোম্পানি যে পত্র সরবরাহ করে থাকে তাকে স্মারক পত্র বলে।

১৪। কার্যতালিকাঃ কর্মচারীদের কাজের বিশদ বিবরণ, তা সম্পাদনের সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাহীবৃন্দের লিখিত তালিকাকে কার্যতালিকা বলে।

৬.৭ ব্যবসায় সাফল্য লাভে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ প্রযুক্তিগত গতিধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি ও উন্নয়নের মূলে রয়েছে উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা।

যোগাযোগ মানবজীবনের একটি সর্ব বিস্মৃত কার্যক্রম। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই যোগাযোগনির্ভর। সুতরাং যোগাযোগের আওতা এতই ব্যাপক যে, তা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে আলোচনা করা যায় না। মানুষের কর্মপরিধি যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যোগাযোগের আওতাও ততদূর বিস্তৃত।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সামাজিক দল গঠনে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিম্নে ব্যবসায় সাফল্য লাভে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হলোঃ

১. লক্ষ্য অর্জনঃ ফলপ্রসূ যোগাযোগ সংগঠনের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে সমর্থ করে। যোগাযোগের উপস্থিতির কারণেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মী সার্বিক লক্ষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়।

২. পরিকল্পনা প্রণয়নঃ ব্যবসায়িক কার্যাবলি দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নানারূপ তথ্য প্রয়োজন হয়। যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরিকল্পনা করা হয়।

৩. পলিসি নির্ধারণ: কারবার সংগঠনের সার্বিক সফলতা নির্ভর করে পলিসি নির্ধারণের উপর। যোগাযোগ বিভিন্ন পক্ষের মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে পলিসি প্রণয়নে সহায়তা করে।

৪. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: পরিকল্পনা প্রণয়নের পর এর সার্বিক বাস্তবায়ন আবশ্যক। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়। যোগাযোগই প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে থাকে।

৫. পরিকল্পনা ও নীতির ব্যাখ্যা: প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত পরিকল্পনা কর্মসূচিসমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যার জন্য অনেক সময়ই নিচের স্তরের কর্মচারীদের উচ্চস্তরের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়।

৬. সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি: কারবার প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা তথা গতিশীলতা বৃদ্ধিতে যোগাযোগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগের তেমন বাস্তব প্রয়োগ নেই সেখানে লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

৭. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি: যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত করে বলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৮. সমস্যা সম্পর্কে অবগত করা: যোগাযোগের মাধ্যমে উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীগণ কারবার প্রতিষ্ঠানের অধস্তন কর্মীদের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে তারা সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ফলে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৯. তথ্যের আদান-প্রদান: যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে। ফলে সবাই তাদের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। এতে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা: কারবারের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের প্রতিনিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আর সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য যা জোগান দেয় দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১১. অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: যোগাযোগ কারবার প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। এরূপ পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক।

১২. সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি: যোগাযোগের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি পায়। ফলে একে অপরকে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে।

১৩. মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা: উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এতে শিল্প বিরোধের মতো অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি হ্রাস পায়।

১৪. পণ্য প্রচার: নতুন উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে সম্ভাব্য ভোক্তাদের অবগত করানোর জন্য প্রচারকার্য সম্পাদনে ব্যবসায়ীকে যোগাযোগের উপর নির্ভর করতে হয়।

১৫. কর্মীদের আগ্রহ সৃষ্টি: যোগাযোগের মাধ্যমে কারবারের বিভিন্ন দিক কর্মীদের অবহিত করে। ফলে কর্মীরা তাদের কার্য সম্পাদনে আগ্রহী হয়।

১৬. নেতৃত্বের বিকাশ: যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে তার নেতৃত্বের প্রসার ঘটাতে পারে। যোগাযোগের উপর গুরুত্বারোপ করা না হলে নেতৃত্ব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

১৭. বাজার গবেষণায় সহায়তা: বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কারবারি জগতে টিকে থাকতে হলে কারবার প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগী এবং ক্রেতাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকলে ব্যবস্থাপক বাজার গবেষণার সাহায্যে এ সমস্ত বিচারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এ সকল তথ্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

১৮. বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক: ব্যবসায়-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিকতা লাভের উদ্দেশে ব্যবসায়ীকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়।

প্রশ্নমালা-৬

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক বা মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো কী কী?
২. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
৩. কর্মী উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
৪. নির্দেশনাকে প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড বলা হয় কেন?
৫. বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
৬. কীভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়?
৭. যোগাযোগ কী?
৮. যোগযোগ প্রক্রিয়া কী?
৯. কর্মী ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
২. উৎপাদন পরিকল্পনার সংজ্ঞা দাও।
৩. উৎপাদন নিয়ন্ত্রক কাকে বলে?
৪. মজুত মাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?
৫. কর্মী সংগ্রের উৎস কয়টি ও কী কী উল্লেখ কর।
৬. কর্মী নির্বাচনের সংজ্ঞা দাও।
৭. যোগাযোগের সংজ্ঞা দাও।
৮. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কাকে বলে?
৯. যোগাযোগকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্নায়ুতন্ত্র বলা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি আলোচনা করো।
২. ব্যবস্থাপনার গৌণ কার্যাবলি আলোচনা করো।
৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করো।
৪. কর্মী সংগ্রহের উৎসগুলো আলোচনা করো।
৫. কর্মী নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।
৬. কর্মী উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।
৭. যোগাযোগের আওতা বা পরিধি আলোচনা করো।
৮. ব্যবসায় যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।

সপ্তম অধ্যায়

লেনদেন ও হিসাবরক্ষণ

(Transaction and Book-Keeping)

ভূমিকা

হিসাবরক্ষণের সাহায্যে আমরা প্রথমত ব্যবসার লেনদেন সংরক্ষণ করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আর্থিক লেনদেনের প্রকৃতি অনুসারে ভাগ করে সাময়িক ফলাফল জানতে পারি এবং এর সমষ্টি নির্ণয় করা যায়। তৃতীয়ত, হিসাব রক্ষণের তথ্য থেকে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করতে পারি।

একজন উদ্যোক্তা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ করতে পারেন। তিনি প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক বিভিন্ন সময়কালের আর্থিক লেনদেন তথ্যের হিসাব রাখতে পারেন। যে পদ্ধতিতেই হিসাব রাখা হোক না কেন বছর শেষে লাভ-ক্ষতি হিসাব (Profit and Loss Account) ও উদ্বৃত্তপত্র (Balance Sheet) তৈরি করা হয়।

বুককিপিং একটি সামাজিক শাস্ত্র। প্রতিদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। এ লেনদেন সংরক্ষণ করা না হলে ব্যবসার লাভ-ক্ষতি হিসাব ও আর্থিক অবস্থা জানা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে হয় বিধায় বিভিন্ন কাজে অর্থ খরচ করতে হয়। বর্তমান জগতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিসাবরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(৭.১)। হিসাবরক্ষণ বা বুককিপিং-এর সংজ্ঞা Definition of Book-Keeping

ইংরেজি 'Book-Keeping' এর বাংলা পরিভাষা হিসাবরক্ষণ। ইংরেজি ভাষায় Book শব্দের অর্থ বই এবং Keeping শব্দের অর্থ সংরক্ষণ। তা হলে Book-Keeping শব্দের অর্থ হলো বই সংরক্ষণ। কিন্তু বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হিসাবের বই এবং এর অর্থ সুষ্ঠু, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে হিসাবরক্ষণের পদ্ধতিকে বোঝায়।

ব্যাপক অর্থে বুককিপিং বলতে ব্যবসা সংঘটিত আর্থিক লেনদেনসমূহ সুষ্ঠু, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হিসাবের বইতে সংরক্ষণ করার কলাকৌশলকে বোঝায়।

(৭.২)। হিসাব রক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ (Objects of Book-keeping)

প্রত্যেক কারবার প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক লেনদেনগুলোর ফলাফল জানতে আগ্রহী। বুককিপিং-এর মাধ্যমে এরূপ ফলাফল জানা সম্ভব। বুক-কিপিং এর মাধ্যমে কারবারি যে কোনো সময় তার ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা, লাভ-ক্ষতি, দেনা-পাওনাদার পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হতে পারে। যে কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ফলাফল নিরূপণ করাই বুক কিপিং-এর প্রধান উদ্দেশ্য। নিম্নে প্রধান উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত হলো:

১. কারবারসংক্রান্ত লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ: কোনো প্রতিষ্ঠানের কারবারসংক্রান্ত লেনদেনগুলোর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হিসাবের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য। এর ফলে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের যে কোনো সময় স্মৃতিশক্তির সাহায্য ছাড়াই লেনদেনের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।

২. কারবারের লাভ-লোকসান নির্ণয়: প্রত্যেক কারবার প্রতিষ্ঠানই কোনো নির্দিষ্ট সময়ান্তে তার আর্থিক ফলাফল অর্থাৎ লাভ-লোকসান জানতে আগ্রহী। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবসায়ী যে কোনো সময় ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান হিসাব তৈরির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান নির্ণয় করতে পারে।

৩. কারবার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ: একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনা, সম্পদ ও দায় মূলধন তথা সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা হিসাববিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য। একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষ তারিখে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

৪. নগদ টাকার অবস্থা নিরূপণ: কারবারের হিসাব বইগুলোর মধ্যে নগদান বই অন্যতম প্রধান বই। এ বইয়ে নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব রাখা হয়। তাছাড়া হাতে নগদ টাকা ও ব্যাংকে জমা নগদের পরিমাণও জানা যায়।

৫. যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দেনার উপর নিয়ন্ত্রণ: সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও দেনার সঠিক অবস্থা জানা যায়। ফলে কারবারের সম্পত্তির পরিমাণ কমে গেলে অথবা দায়-দেনার পরিমাণ বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৬. কারবার প্রতিষ্ঠানের দেনা ও পাওনার পরিমাণ নির্ধারণ: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানে সমুদয় আর্থিক লেনদেনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দিনে কারবার প্রতিষ্ঠানের মোট দেনা ও পাওনার পরিমাণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

৭. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানে সমুদয় আর্থিক লেনদেনগুলোকে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট দিনে কারবার প্রতিষ্ঠানের মোট দেনা ও পাওনার পরিমাণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

৮. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা: কারবার প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো সঠিকভাবে হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণের ফলে প্রত্যেক হিসাব খাতের ব্যয়ের পরিমাণ পৃথকভাবে জানা যায়। ফলে ব্যবসায়ী প্রয়োজনবোধে তার ব্যবসার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ২০১৪

৯. হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি লেনদেন হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণ করলে এবং পরবর্তীতে রেওয়ামিল তৈরি করার মাধ্যমে হিসাবসমূহের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ।

১০. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: বর্তমানকালে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে চুরি ও জালিয়াতি হওয়ার আশঙ্কা আছে । সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করলে সহজেই এসব ধরা পড়ে এবং সহজেই তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় ।

১১. কর নির্ধারণে সহায়তা: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের সমুদয় হিসাব স্বীকৃত হিসাব পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হলে আয় কর বা বিক্রয় কর কর্তৃপক্ষের নিকট তা অধিক গ্রহণযোগ্য হয় । ফলে হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আয়কর এবং বিক্রয় কর সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান সহজতর হয় ।

১২. কারবার পরিচালনায় সাফল্য অর্জন: কোনো কারবার প্রতিষ্ঠানের সমুদয় লেনদেনগুলো হিসাবের বইয়ে সংরক্ষণের ফলে ব্যবসায়ী কারবারের বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারে । ফলে কারবারি কারবারের বিভিন্ন তথ্য প্রয়োগের মাধ্যমে কারবারের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কারবার পরিচালনার সাফল্য অর্জন করতে পারে ।

১৩. অর্থনৈতিক তথ্য পরিবেশন করা: আর্থিক বিবরণী, বিবৃতি ও প্রতিবেদন তৈরি করে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অর্থনৈতিক তথ্য যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট পক্ষকে জানানো হিসাবরক্ষণের উদ্দেশ্য ।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, হিসাবরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠুভাবে ও সঠিক নিয়মে হিসাব সংরক্ষণ করে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে লাভবান হতে সহায়তা করে ।

(৭.৩) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Method of Book keeping)

হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি দুইরকম । যথা–

১. একতরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি ।

২. দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি ।

হিসাবরক্ষণের এ পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System) । বর্তমানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিসাবরক্ষণ আধুনিক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে । দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতি বর্ণনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে জানা দরকার ।

১. সম্পদ (Assets)

২. মূলধন (Capital)

৩. ঋণ (Credit)

৪. লেনদেন (Transaction)

১০১৪ দু'তরফা দাখিলা হিসাব পদ্ধতিতে এ তিন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে হিসাব রক্ষিত হয় ।

১. সম্পদ (Assets): এখানে সম্পদ বলতে ব্যবসার প্রয়োজনে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হয়। যেমন–জমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্টেশনারি দ্রব্য, এমনকি নগদ টাকাও সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

২. মূলধন (Capital): মূলধন হচ্ছে ব্যবসায় সম্পদ ক্রয় করার জন্য এবং সেই সাথে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ ও ব্যবসায় মূলধন।

৩. ঋণ (Credit): ঋণ হচ্ছে উক্ত সম্পদগুলোর ক্রয় করার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোনো শর্তের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে তখন সেই পরিমাণ অর্থকে ঋণ বলে। যেমন–ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, কোনো পণ্য দ্রব্য বাকিতে ক্রয় করা অথবা কোনো পাওনা এখনও পরিশোধ করা হয়নি এমন অর্থও ঋণ পাওনা হিসাবে দেখানো হয়।

৪. লেনদেন (Transaction): যে সব ঘটনা অর্থমুল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায়, দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আনে তাকে লেনদেন বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি (Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হিসাব ব্যবস্থা। ইতালীয় পণ্ডিত লুকা প্যাসিওলি ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রচলন করেন। বর্তমান বিশ্বে এ পদ্ধতিটি হিসাবরক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত এবং সুসংবদ্ধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে পদ্ধতির প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অংকে একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাব বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

প্রত্যেক ব্যবসায়ের লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকে। একটি ডেবিট পক্ষ এবং অপরটি ক্রেডিট পক্ষ। যে পক্ষ গ্রহণ করে তাকে ডেবিট এবং যে পক্ষ প্রদান করে তাকে ক্রেডিট বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Definition of Double Entry System):

যে পদ্ধতির প্রতিটি লেনদেনের দুটি পক্ষকে সমান টাকার অংকে একটিকে ডেবিট এবং অপরটিকে ক্রেডিট করে হিসাবের বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির কতিপয় জনপ্রিয় সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. উইলিয়াম পিকলস-এর মতে, 'দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে টাকা বা টাকায় পরিমাপযোগ্য প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত সত্তায় প্রকাশ করা হয়। ফলে একটি হিসাব খাতকে প্রাপ্ত সুবিধার জন্য ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারী হিসাবকে ক্রেডিট করা হয়। এটাই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।'

২. অধ্যাপক ক্রুক ও পামার আর্চারের মতে, 'প্রতিটি লেনদেনের দ্বৈত সত্তা লিপিবদ্ধ করে কারবারের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।'

৩. স্পাইসার ও পেগলার-এর মতে, 'যে পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনকে সমপরিমাণ অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ এক বক্তির নিকট হতে যে সুবিধা পায় এবং অপর ব্যক্তিকে সমান মূল্যের সুবিধা প্রদান করে তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।'

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, হিসাব পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিট এই দ্বৈত সত্তা দু'টি পৃথক হিসাব খাতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of Double Entry System)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। নিম্নে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো:

১. লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লেনদেনের দ্বৈত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা সম্ভব।

২. গাণিতিক নির্ভুলতা যাচাই: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণের মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

৩. লাভ-লোকসান নির্ণয়: এ পদ্ধতিতে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবসমূহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়; ফলে কোনো নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে সহজেই লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রস্তুত করে কারবারের সঠিক লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা যায়।

৪. দেনা-পাওনার পরিমাণ জানা: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে মোট দেনা ও মোট পাওনার পরিমাণ জানা যায় এবং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা সহজ হয়।

৫. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব যথাযথভাবে রাখা হয়। ফলে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়।

৬. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ: তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচ কমিয়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ: এ পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হলে চলতি হিসাবকালের সাথে সহজেই এক বা একাধিক হিসাবকালের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা যায়।

৮. চুরি ও জালিয়াতি রোধ: এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে হিসাবের ভুলত্রুটি ও জালিয়াতি সহজে উদ্‌ঘাটন করা যায় এবং চুরি ও জালিয়াতির হাত থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে রক্ষাও করা যায়।

৯. তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ: এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সহজেই সংগ্রহ করা যায় এবং প্রয়োজনে তথ্যসমূহ সরবরাহ করে ব্যবসায়ীকে সহায়তা করা যায়।

১০. সহজ প্রয়োগ: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিটি নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হওয়ায় ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োগ করা যায়।

(৭.৪) মোবাইল ব্যাংকিং ও এর কার্যাবলি

মোবাইল ব্যাংকিং বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরে এক যুগান্তরকারী পদ্ধতি। নগদ টাকার লেনদেন মুহূর্তেই গ্রাহকের নিকট পৌছে দেওয়ার অনলাইন সিস্টেমকে মোবাইল ব্যাংকিং বলে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট। আজকাল প্রায় ব্যাংকেই মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম চালু হয়েছে। যা এটিএম বুথে মেশিনে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা একাউন্টে গচ্ছিত থাকা সাপেক্ষে উত্তোলন করা সম্ভব হয়। মোবাইল সিম এবং একাউন্ট ব্যবহার করে মোবাইলে ক্যাশ লে-দেন সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশে জনপ্রিয় মোবাইল ব্যাংকিং এর মধ্যে বিকাশ, রকেট এবং এম-ক্যাশ উল্লেখযোগ্য।

(৭.৫) ব্যবসায় হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ লেখার নিয়মাবলি

নগদান বই (Cash Book): যে হিসাবের বইয়ে সর্বপ্রকার নগদ টাকার আদানপ্রদান বা প্রাপ্তি পরিশোধ সংক্রান্ত তারিখের ক্রমানুসারে প্রাথমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ান্তে ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয় তাকে নগদান বই বলা হয়। নগদান বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় দু'টি দিক থাকে। একটি ডেবিট দিক এবং একটি ক্রেডিট দিক। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত নগদ টাকা ডেবিট দিকে এবং যাবতীয় নগদ টাকা প্রদান বা পরিশোধ ক্রেডিট দিকে লেখা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর নগদান বইয়ের জের বা ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নগদ প্রাপ্তি অপেক্ষা নগদ প্রদানের পরিমাণ কখনোই বেশি হতে পারে না। তাই নগদান বইয়ের সর্বাবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স হয়। উক্ত ডেবিট ব্যালেন্সের পরিমাণ নগদ তহবিলের সমান হয়।

নগদান বইয়ের শ্রেণিবিভাগ (Classfication of Cash Book)

কারবার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত লেনদেনের প্রকৃতি, পরিমাণ ও প্রয়োজন অনুসারে নগদান বইকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. একঘরা নগদান বই (Single Column Cash Book)
২. দু'ঘরা নগদান বই (Double Column Cash Book
৩. তিনঘরা নগদান বই (Three Column Cash Book)
৪. খুচরা নগদান বই (Petty Column Cash Book)

নিম্নে নগদান বইয়ের উপরোক্ত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

১. একঘরা নগদান বই (Single Column Cash Book)

যেসব প্রতিষ্ঠানে নগদেই অধিকাংশ লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে সেসব প্রতিষ্ঠানে একঘরা নগদান বই সংরক্ষণ করে। যে নগদান বইয়ের উভয় দিকে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য একটি করে ঘর থাকে তাকে একঘরা নগদান বই বলে। সাধারণ ছোট ছোট বই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এ বই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপ:

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	রসিদ	খ.পৃ:	পরিমাণ টাকা	তারিখ	বিবরণ	রসিদ	খ.পৃ	পরিমাণ টাকা

টেবিল-৫

১. দু'ঘরা নগদান বই (Double Column Cash Book

নগদ ও ব্যাংকসংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য যে নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে নগদ ও ব্যাংকের জন্য পৃথক টাকার ঘর রাখা হয় তাকে দু'ঘরা নগদান বই বলা হয়। সকল প্রকার নগদ ও ব্যাংক প্রাপ্তিসমূহ এ বইয়ের ডেবিট দিকে এবং সকল প্রকার নগদ ও চেকের মাধ্যমে প্রদান ক্রেডিট-এর দিকে লেখা হয়।

দু'ঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপঃ

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	নগদ	ব্যাংক

টেবিল-৬

৩. তিনঘরা নগদান বই (Three Column Cash Book)

যে নগদান বইয়ে ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় পার্শ্বে নগদ, ব্যাংক ও বাট্টাসংক্রান্ত লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য তিনটি করে টাকার ঘর থাকে তাকে তিনঘরা নগদান বই বলা হয়। দেনাদারের নিকট হতে টাকা আদায় করার জন্য যে বাট্টা প্রদান করা হয় তা ডেবিট দিকের বাট্টার ঘরে লিখতে হয় এবং পাওনাদারকে টাকা পরিশোধ করার সময় যে বাট্টা পাওয়া যায় তা ক্রেডিটের দিকে বাট্টার ঘরে লিখতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাট্টার জন্য ব্যালেন্স নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই। কারণ ডেবিট ও ক্রেডিট ঘরের যোগফল স্বতন্ত্র খতিয়ান ব্যালেন্স হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিনঘরা নগদান বইয়ের ছক নিম্নরূপঃ

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ.	বাট্টা	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ.পৃ	বাট্টা	নগদ	ব্যাংক

টেবিল-৭

৪. খুচরা নগদান বই (Petty Column Cash Book): যে নগদান বইতে কারবার প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন ছোট অংকের খরচগুলো তারিখের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে খুচরা নগদান বই বলা হয়।

দু'ঘরা এবং তিনঘরা নগদান বই প্রস্তুত করার নিয়মাবলি

(Rules for Preparing Double, Tripple Column Cash Book)

১. প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এবং ব্যাংক উদ্বৃত্তঃ দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইতে ডেবিট দিকে ব্যালেন্স সি/ডি বাবদ নগদ তহবিল নগদ ঘরে এবং ব্যাংক উদ্বৃত্ত ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যাংক জমাতিরিক্ত থাকলে ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

২. নগদ অর্থ প্রাপ্তি ও নগদ অর্থ পরিশোধ: নগদ অর্থ পাওয়া গেলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বহির ডেবিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে। নগদ অর্থ পরিশোধ করা হলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বহির ক্রেডিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে।

৩. চেক প্রাপ্তি: চেক প্রাপ্ত হয়ে ব্যাংকে জমা না দেওয়া পর্যন্ত নগদ টাকার শামিল। চেক প্রাপ্তি দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে নগদ ঘরে লিখতে হবে।

৪. চেক প্রদান: চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৫. ব্যাংকের টাকা জমা রাখা: যখন নগদ টাকা নগদ তহবিল হতে ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় তখন দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে একটি করে জায় করতে হয়। ব্যাংক নগদ টাকা জমা দেওয়ার ফলে উক্ত পরিমাণ টাকা নগদ তহবিল হতে চলে যায়; পক্ষান্তরে ব্যাংক উক্ত টাকা গ্রহণ করে। সেহেতু নগদ তহবিল দাতা এবং সে জন্য এটি নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে টাকার পরিমাণ কক্ষে লিখতে হবে। আবার ব্যাংক উক্ত টাকা গ্রহণ করে তাই ব্যাংক গ্রহীতা এবং সেহেতু উক্ত টাকার পরিমাণ দিয়ে ব্যাংক হিসাব ডেবিট হয়। অর্থাৎ নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বস্থিত ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে তা লিখতে হবে। বিপরীতমুখী দাখিলাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়।

৬. ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন: ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় পার্শ্বে একটি করে জায় লিখতে হয়। ব্যাংক হতে টাকা তোলার ফলে ব্যাংক দাতা হয় বিধায় উক্ত টাকা নগদ তহবিলে আগমন করে, সেহেতু নগদ তহবিল গ্রহীতা রূপে গণ্য হয়। সুতরাং ব্যাংক হতে টাকা তোলা হলে প্রথমবার দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বস্থিত ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে লিখতে হয় এবং দ্বিতীয়বার এটি উভয় নগদান বইয়ের ডেবিট পার্শ্বস্থিত টাকার পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ বিপরীতমুখী দাখিলাকে বাট্টা এন্ট্রি বলা হয়।

৭. চেক পেয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দিলে: চেক পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংকে জমা দিলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৮. প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরণ: প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

৯. আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়া: যদি কোনো প্রাপ্য বিল আদায়ের জন্য ব্যাংকে প্রেরিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতকের নিকট হতে আদায় না হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় তখন এ প্রত্যাখ্যাত বিল দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিটে ব্যাংক ঘরে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১০. মালিকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন: মালিক কর্তৃক ব্যাংক হতে নিজ প্রয়োজনে সরাসরি টাকা উত্তোলনের জন্য নগদ তহবিল কোনোরূপ প্রভাবিত হয় না। এ টাকা সরাসরি মালিকের নিকট চলে যায় বলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১১. ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদেয় বিল পরিশোধঃ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হলে দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে ব্যাংক পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১২. সরাসরি ব্যাংকে প্রদানঃ যদি কোনো দেনাদার আমাদের কারবারের পক্ষে ব্যাংকে সরাসরি টাকা জমা দেয় অথবা যদি ব্যাংক আমাদের পক্ষে অপর কারো নিকট হতে টাকা আদায় করে তবে তা দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১৩. ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদঃ ব্যাংক জমা টাকার উপর সুদ প্রদান করে। এ সুদের জন্য ব্যাংকে জমা টাকা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ব্যাংক মঞ্জুরীকৃত সুদ দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে।

১৪. ব্যাংক চার্জঃ ব্যাংক মাঝে মাঝে আমানতকারীর বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদন করে থাকে এবং এ সমস্ত কাজের জন্য কিছু কমিশন ধার্য করে। ব্যাংক কর্তৃক ধার্যকৃত এরূপ কমিশনকে ব্যাংক চার্জ বলে। ব্যাংক চার্জ দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট দিকে ব্যাংক ঘরে লিখতে হবে। কারণ উক্ত টাকা গ্রাহকের হিসাব থেকে কেটে রাখা হয়।

১৫. মঞ্জুরীকৃত নগদ বাট্টা ও প্রাপ্ত নগদ বাট্টাঃ মঞ্জুরকারী প্রতিষ্ঠান-এর তিনঘরা নগদান বইতে এ মঞ্জুরীকৃত নগদ বাট্টা উক্ত নগদান বহির ডেবিট পার্শ্বে বাট্টা পরিমাণ ঘরে লিপিবদ্ধ করবে। পাওনাদারগণের নিকট নগদ বাট্টা পাওয়া যেতে পারে। এরূপ প্রাপ্ত বাট্টা একটি আয় এবং এটি তিনঘরা নগদান বইয়ের ক্রেডিট পার্শ্বে বাট্টা পরিমাণ কক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১৬. কন্ট্রা এন্ট্রি এর সংজ্ঞা (Definition of Contra Entry)ঃ নগদ ও ব্যাংক সম্পর্কীয় লেনদেনগুলোর কতিপয় দফা আছে যেগুলোর প্রতিটি কন্ট্রা এন্ট্রি বলা হয়। যেমন–কারবারের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে এবং কারবারের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হলে, দু'ঘরা ও তিনঘরা নগদান বইয়ের উভয় দিকে লিখতে হয়। ডেবিটের দিকে নগদ ঘরে লিপিবদ্ধ করা হলে ক্রেডিটের দিকে ব্যাংক ঘরে লিপিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে, ডেবিট দিকে ব্যাংক ঘরে লেখা হলে তা ক্রেডিট দিকে নগদ ঘরে লেখা হবে। এ জাতীয় দাখিলাকে কন্ট্রা এন্ট্রি বা বিপরীত দাখিলা বলা হয়।

উদাহরণঃ ১। নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বন করে মেসার্স রানা এন্ড কোং-এর একটি নগদান বই তৈরি কর।

<u>২০২০ **সাল**</u>

জানুয়ারি-১ নগদ জমার উদ্বৃত্ত ১৫,০০০.০০ টাকা এবং ব্যাংকে নগদ জমা ২০,০০০.০০ টাকা।

জানুয়ারি-২ অফিসের জন্য ব্যাংক থেকে উত্তোলন করা হলো ৫০০.০০ টাকা

জানুয়ারি-৩ মজুরি নগদ ২,০০০.০০ টাকা চেক দিয়ে ৩,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হলো।

১০৪ জানুয়ারি-১২ জনাব নাদিমের কাছ থেকে তার একটি স্বীকৃত বিল পাওয়া গেল ২,০০০.০০ টাকা এবং

বিলটি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

জানুয়ারি-১৫ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২,০০০.০০ টাকা

জানুয়ারি-১৮ পণ্য ক্রয় করে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলো ৩,০০০.০০ টাকা

জানুয়ারি-২০ ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য উত্তোলন করা হলো ৩০০.০০ টাকা

জানুয়ারি-২৫ চেকের মাধ্যমে বাড়ি ভাড়া প্রদান করা হলো ৩০০.০০ টাকা

জানুয়ারি-৩০ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১০০.০০ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ ধার্য করা হলো ৫০০.০০ টাকা

মেসার্স রানা এন্ড কোং

নগদান বহি (দু'ঘরা)

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	নগদ	ব্যাংক	তারিখ	বিবরণ	খ. পৃ.	নগদ	ব্যাংক
২০২০					২০২০				
জানু-১	টু প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত		১৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	জানু- ৩	বাই নগদান	ক		৫০০.০০
,, ৩	,, ব্যাংক	ক)	৫০০.০০		,, ৮	মজুরী হিসাব		২,০০০.০০	৩,০০০.০০
,, ১২	,, প্রাপ্য বিল			২,০০০.০০	,, ১৫	,, ব্যাংক	ক	২,০০০.০০	
,, ১৫	,, নগদান হিসাব	ক		২,০০০.০০	,, ১৮	,, পণ্য ক্রয় হিঃ			৩,০০০.০০
,, ৩০	,, ব্যাংকে মঞ্জুরী কৃত সুদ			১০০.০০	,, ২০	,, উত্তোলন হিসাব			৩০০.০০
					,, ২৫	,, বাড়ি ভাড়া হিসাব			৩০০.০০
					,, ৩০	,, ব্যাংক চার্জ			৫০.০০.০০
					,, ৩১	,, উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হবে		১১.৫০০'০০	১৬৯৫০'০০
			১৫,৫০০.০০	২৪,১০০.০০				১৫,৫০০.০০	২৪,১০০.০০
ফেব্রু ১	উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়েছে		১১.৫০০'০০	১৬৯৫০'০০					

টেবিল-৮

নগদান বই সর্বাবস্থায় ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশঃ

নগদান বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় দুটি দিক থাকে। একটি ডেবিট দিক এবং অন্যটি ক্রেডিট দিক। প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত নগদ টাকা ডেবিট দিকে এবং ক্রেডিট দিকে যাবতীয় নগদ প্রদান বা পরিশোধ লিপিবদ্ধ করা হয়। নগদান বইতে সমস্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর এর ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। নগদান বইয়ের এ ব্যালেন্স সর্বাবস্থায় ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে। কারণ নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ হতে নগদ পরিশোধের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই বেশি হতে পারে না।

হিসাব চক্রের নমুনা

চিত্রঃ ৯ হিসাব চক্র

১. জাবেদাকরণ (Journalising): জাবেদা হিসাবরক্ষণের প্রাথমিক বই। ব্যবসায়ের প্রতিটি লেনদেন সমূহ সর্বপ্রথমে ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রমানুসারে জাবেদা বইয়ে লিপিবদ্ধ করা। এটা হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ। জাবেদা বইকে সাধারণ জাবেদা বলে।এটা ছাড়া কিছু কিছু ভিন্নধর্মী জাবেদা বই রয়েছে। যেমন–ক্রয় বই ও বিক্রয় বই, ক্রয় ফেরত, বিক্রয় ফেরত বই, নগদান বই, প্রাপ্য বিল, প্রদেয় বিল, বেতন বহি ইত্যাদি।

২. খতিয়ানভুক্তকরণ (Posting for Ledger): হিসাব চক্রের দ্বিতীয় ধাপ হলো খতিয়ানভুক্তকরণ। জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ লেনদেন একই শ্রেণির হিসাব বইতে রেকর্ড করাকে খতিয়ানভুক্তকরণ বলে।

খতিয়ান বইতে লেনদেনগুলো পাকাপাকিভাবে পৃথক পৃথক হিসাবরক্ষণ করা হয়। খতিয়ান বই অনেকগুলো। যেমন–নগদান হিসাব, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি হিসাব, মাল ক্রয় হিসাব, মাল বিক্রয় হিসাব ইত্যাদি। খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক হিসাব দেখে ব্যবসায় সামগ্রিক আর্থিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। খতিয়ান দেখে ব্যবসার দেনা-পাওনার পরিমাণ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ, লাভ-লোকসান নির্ণয়, আর্থিক অবস্থা হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।

৩. রেওয়ামিল তৈরিকরণ (Preparing Trial Balance): হিসাব চক্রের তৃতীয় ধাপ রেওয়ামিল প্রস্তুত করা খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হিসাবসমূহের ডেবিট জের ও ক্রেডিট জেরগুলোকে একটি বিবরণীর মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করাকে রেওয়ামিল বলে। প্রতিটি খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট ব্যালেন্স রেওয়ামিলের ডেবিট ও ক্রেডিট পার্শ্বে স্থানান্তর করে উভয় পার্শ্বের যোগফল নির্ণয় করাই রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ। খতিয়ান হিসাবগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল তৈরি করা হয়।

হিসাবে কোনো গরমিল না থাকলে রেওয়ামিলের দুই দিক সমান হয়। যদি কোনো কারণে উভয় দিক সমান
১০৪ না হয় তবে বুঝতে হবে হিসাবের কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে।

৪. আর্থিক বিবরণী তৈরিকরণ (Preparation Financial Statement): হিসাব চক্রের চতুর্থ ধাপ হলো আর্থিক বিবরণী তৈরিকরণ। এ পর্যায়ে রেওয়ামিল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বছরের শেষে ব্যবসার ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-লোকসান হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করে আর্থিক ফলাফল নিরূপণ করা হয়।

৫. আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Analysis of Financial Statement): ব্যবসায়ীকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যেন ভবিষ্যতে ব্যবসা হতে মুনাফা অর্জন করা যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসার প্রতি বছরের শেষে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসার সাফল্য-ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা যায় এবং পরবর্তীতে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

চূড়ান্ত হিসাবের সংজ্ঞা (Definition of Final Account): ব্যবসার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। প্রত্যেক ব্যবসায়ী জানতে চায়, কোনো নির্দিষ্ট সময় পরে ব্যবসায় কত লাভ হলো কত ক্ষতি হলো। একমাত্র চূড়ান্ত হিসাব কারবারের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ধারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে কারবার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ-লোকসান এবং সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য যে সমস্ত হিসাব ও বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকেই সমষ্টিগতভাবে চূড়ান্ত হিসাব বলে।

সেবামূলক ব্যবসা (Service Business)

যে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় উৎপাদনের সাথে জড়িত না হয়ে আত্মকর্মসংস্থামূলক পেশার সাথে জড়িত রয়েছে তাদেরকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন– হোটেল, ক্যান্টিন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন কোম্পানি, ইত্যাদি। সেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ব্যয় পর্যায় এসে সংগ্রহ করা হয় এবং মোট পরিচালন ব্যয়কে নির্দিষ্ট সময়ান্তে মোট সেবা একক দিয়ে ভাগ করে সেবা এককের ব্যয় নির্ণয় করা হয়।

১০১৪

প্রশ্নমালা-৭

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. হিসাবরক্ষণ কী?

২. হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী?

৩. নগদান বহির শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

৪. সেবামূলক ব্যবসা কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা দাও।

২. নগদান বহির সংজ্ঞা দাও।

৩. চূড়ান্ত হিসাব কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বুক-কিপিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করো।

২. দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ আলোচনা করো।

৩. মেসার্স সাম্য এন্ড কোং-এর নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো অবলম্বনে একটি দু'ঘরা নগদান বহি তৈরি করো।

২০২০ ইং

নভেঃ-১ হাতে নগদ ৭,০০০ টাকা এবং ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত ১১,০০০ টাকা

নভেঃ-৫ মিঃ শুভ এর নিকট ৪,০০০ টাকার মাল বিক্রয় করা হলো এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ পাওয়া গেল।

নভেঃ-৭ মাল ক্রয় করা হলো ১,০০০ টাকা এবং চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হলো।

নভেঃ-১০ ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো ২,৫০০ টাকা।

নভেঃ-১২ অফিসের প্রয়োজনে ১,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৩৫০ টাকা উঠানো হলো।

নভেঃ-১৯ শরিফ ব্রাদার্সকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করা হলো।

নভেঃ-২১ ছালামের নিকট হতে প্রাপ্ত ৪,০০০ টাকার একটি চেক ঐ দিনই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো।

নভেঃ-২৭ ভাড়া বাবদ ২০০ টাকা নগদ ও বেতন বাবদ চেকে ১,০০০ টাকা দেওয়া হলো।

নভেঃ-২৯ ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ ১০০ টাকা ও ধার্যকৃত চার্জ ২০০ টাকা।

অষ্টম অধ্যায়

সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন

Analysis & Inspection of the fact of Successful Enterpreneur

ভূমিকা (Introduction): সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষন করে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে এবং সাফল্যের কারণসমূহ জানতে পারবে। ব্যবসা সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা আবশ্যক। পরিদর্শন পর্যায়ক্রমে ও সুশৃঙ্খল হওয়া উচিত। প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তগুলো খাতায় লিখে নেওয়া উচিত যাতে প্রতিবেদন রচনায় কোনো অসুবিধা না হয়।

একজন সফল উদ্যোক্তার ঘটনা বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী ১৯২৬ সালে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের ধেওয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্যমিত্র হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উপমহাদেশে চল্লিশের দশকে যখন বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব চলছিল তখন পাকিস্তান আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ সময় জনাব চৌধুরী এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। আর্থিক সংকটের কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অপরাগ হয়ে তিনি একটি চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে তিনি একজন বন্ধুসহ রাউজানের ফকিরহাটে ৬২০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি বই-এর দোকান স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেন। মূলধনের অধিকাংশ মালিক ছিলেন তার বন্ধু। মূলধনে তাঁর নিজের অংশ যেটুকু ছিল তা তিনি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার কর্জ করে সংগ্রহ করেন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ থেকেই তিনি বইয়ের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শুধু জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে স্কুলগামী ছাত্রদের প্রয়োজনানুসারে বই বিক্রি করে যে আয় হতো তাতে চলা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা বন্ধু মিলে বইয়ের ব্যবসায়ের সাথে মনিহারি দ্রব্যের ব্যবসাও শুরু করলেন, যাতে আয় বৃদ্ধি পায়। দুইবছর যাবৎ ব্যবসা চালিয়েও আশানুরূপ মুনাফা করতে না পেরে জনাব চৌধুরী চট্টগ্রাম শহরে বর্তমান সমবায় সমিতি সদনের সামনে মাসিক ১৮ টাকা ভাড়ায় একটি ছনের তৈরি দোকান ভাড়া নেন। সেখানে তিনি দুই হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে মনিহারি দোকান শুরু করেন (রাউজানের ব্যবসায় গুটিয়ে তার বন্ধু ১৯৪৮ সালে তাঁর সাথে যোগ দেন)।

কিন্তু, দোকান থেকে যে আয় হতো তা দিয়ে একটি ছোট পরিবারই চালানো খুব কঠিন ছিল। তখন জনাব চৌধুরী অন্যান্য সুযোগের সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং পাকিস্তানের করাচি থেকে প্রকাশিত ডন গ্রুপের 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' নামে একটি পত্রিকা চট্টগ্রামের জন্য নিজের নামে এজেন্সী গ্রহণ করেন। এই এজেন্সির জন্য তাঁকে এক হাজার টাকা জামানত প্রদান করতে হয়। এ টাকা তাঁর পিতা সংগ্রহ করে দেন। এই সময় তিনি পুরনো দোকানের সন্নিকটে 'নিউজ ফ্রন্ট' নামে আর একটি দোকান মাসিক ৯ টাকা ভাড়ায় দখল নেন।

আপোসের মাধ্যমে পুরা দোকানটি বন্ধুকে দিয়ে দেন। তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার এজেন্ট নিযুক্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন উর্দু বই ও জার্নালও তাঁর দোকানে বিক্রি হতো। ১৯৫১-৫২ সালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা 'ডন" এবং 'পাকিস্তান টাইমস', 'গুজ বাড়ী ডন', 'মিল্লাত' প্রভৃতির এজেন্সি পান। ফলে তাঁর ব্যবসায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সময়ে তিনি পার্শ্ববর্তী দোকানটি ভাড়া নিয়ে তার বড় ভাইয়ের সহায়তার ব্যবসায় চালাতে থাকেন।

তাঁর ব্যবসায়ের যখন রমরমা অবস্থা তখন তিনি পেংগুইন ও পেলিকান পেপারব্যাক বইপত্র আমদানি শুরু করেন। তাঁর এসব বই ও ইংরেজি সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের প্রধান খরিদ্দার ছিল বিদেশিরা।

এই পর্যায়ে জনাব চৌধুরী একটি প্রিন্টিং প্রেস (ছাপাখানা) প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালে বিশ হাজার টাকা ব্যায়ে তিনি 'সিগনেট' প্রেস স্থাপন করেন। এই প্রেসে ২০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। প্রেসের জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারি প্রথমে স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানি থেকে আমদানি করা হয়। ১৯৬০ সালে বিদেশ থেকে কিছু প্রিন্টিং ও কাটিং মেশিন আমদানি করে ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তৃত করেন। এই সময়ে তিনি প্রকাশনা ব্যবসায়েও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কতিপয় বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই ছাপান এবং সম্ভাবনাময় লেখকদেরকে ধারে বই ছাপানোর ব্যাপারে সাহায্য করেন। কিন্তু প্রকাশিত বইগুলি ভালো বিক্রি না হওয়ায় সাহায্য গ্রহণকারী লেখকরা তাঁদের বইগুলি ডেলিভারি নেননি। প্রকাশনা ব্যবসায়ে মার খেয়ে তিনি প্যাকেজিং শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট নন। ১৯৬১ সালে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবিপি) থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পশ্চিম জার্মানি থেকে প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং মেশিনারি আমদানি করেন।

সে সময় চট্টগ্রামে আরও দুটি প্যাকেজিং ইউনিট ছিল। তিনি তাঁর ছাপাখানার পাশে আলাদা জমিতে প্যাকেজিং শিল্প স্থাপন করেন। সেখানে ত্রিশ জন লোককে নিয়োজিত করতে হয়েছিল।

তখনকার আমলে প্যাকেজিং মেশিন চালানোর জন্য আমাদের দেশে দক্ষ কারিগর ছিল না। করাচিতে অবস্থানরত পশ্চিম জার্মানির হাইডেলবার্গ কোম্পানির প্রকৌশলীরা এসে জনাব চৌধুরীর কর্মচারীকে মেশিন পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তৎকালীন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৬৭ সালে প্যাকেজিং ব্যবসাকে আরও সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আইডিবিপি-এর নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং '৬৯ সালে মেশিনারি আমদানি করেন। তিনি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের সাথে তাদের ইমারতের পেছনে ছয় হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি দালান তৈরি করার জন্য (এক লাখ টাকা অগ্রিম ভাড়া দিয়ে) একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই দালানে পরে ছাপাখানা ও প্যাকেজিং ইউনিট স্থানান্তর করা হয়। ইতোপূর্বে ১৯৬৫ সালেই বিপনি বিতানে নিউজ ফ্রন্ট ও পুরানো দোকানটি স্থানান্তর করা হয়।

১৯৭০ সালে প্যাকেজিং মেশিনারিজ শেষ চালান এসে পৌঁছায়। যন্ত্রপাতি স্থাপিত হওয়ার পরপরই স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সবকিছু একজন গার্ডের তত্ত্বাবধানে রেখে দিয়ে তিনি রাউজানে গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

তাঁর অবর্তমানে ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পূর্বে দুইজন মিলিটারি, আলবদর, রাজাকারদের একটি বাহিনীসহ জনাব চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে তাকে পরিবারসহ মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তিনি যথাসর্বস্ব প্রদান করে জীবন রক্ষা করেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি অনাদায়ী নিউজ পেপার বিল বাবদ এক লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। হকারদেরকে প্রদত্ত ত্রিশটি বাইসাইকেলও হারান।

স্বাধীনতার পর অবাঙালি কারিগররা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় কারিগরের সংকটে পড়ে তাঁর ব্যবসা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি নিজ উদ্যোগে স্থানীয় কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আবার ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে জনাব চৌধুরী ষোলশহরের বিসিক শিল্প নগরীতে সিগনেট বক্স ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করেন। এই প্রকল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দশ লাখ টাকা পুঁজি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে 'পূর্বকোণ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন।

জনাব চৌধুরী একজন সফল উদ্যোক্তা, শূন্য থেকে আরম্ভ করে তিনি একটি সম্প্রসারণশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বর্তমানে বাজার দরে তাঁর চারটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদের মোট মূল্য চার কোটি টাকার বেশি। তাঁর দীর্ঘ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, সফল উদ্যোক্তার কয়েকটি বিশেষ গুণ অপরিহার্য। কারণ প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধান; ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা পূর্বানুমান করার ক্ষমতা, ভবিষ্যৎ কারবার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা, যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ এবং পণ্য বিপণনের জন্য সঠিক বণ্টন প্রণালির ব্যবহার। তিনি উল্লেখ করেন যে, সফল উদ্যোগের পথে অন্যতম অন্তরায় হলো সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশনার অভাব।

কেসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত শিল্পোদ্যোগ পরিচিতি বই থেকে সংকলিত যা ২০১৬ সালের পূর্বে তৈরি করা হয়েছে।

পরিদর্শনের সংজ্ঞা (Definition of Inspection)

ব্যবসা সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর সরেজমিনে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রকৃতি, আকৃতি, অবস্থা, উৎপাদন ও সেবা সম্পর্কে ধারণা লাভের প্রক্রিয়াকে পরিদর্শন বলে। পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা প্রদান করা, যাতে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি

তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন করলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়ে ধারণা অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিদর্শনের কতকগুলো সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য

পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা, যাতে ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্বন্ধে তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

খ. সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

পরিদর্শনের কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ব্যবসায় বা শিল্পের পরিবেশ ও কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখার ও কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করার সুযোগ দান।

২. ব্যবসাকে যারা জীবিকা অর্জনের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে, তাদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ দান।

৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় ও শিল্পোদ্যোগীর ভূমিকা কী সে সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দান।

৪. ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী হওয়ার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্দীপ্ত করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি অনুসরণের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া পরিদর্শনের ফলে তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কার্যপ্রণালি

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের কতিপয় নিয়ম/শর্ত অনুসরণ করতে হয়। যেমন–

সময়: পরিদর্শনের দিন ও তারিখ স্থির করতে হবে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি: ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, প্রশ্নাবলির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিদর্শনের জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করবেন।

অনুমতি গ্রহণ: পরিদর্শনের পূর্বে অধ্যক্ষের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মালিক বা ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে।

তথ্যাবলি: শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর তথ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে:

১. ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

২. উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি

৩. কর্মীর দক্ষতা সম্পর্কিত ইত্যাদি

২০২৪

৪. পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি
৫. ব্যবসায় বা শিল্পোদ্যোক্তার সাফল্যের বিবরণ।

কার্যাবলি: প্রতিটি গ্রুপের সাথে পরিদর্শনকালে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা-প্রদান করবেন। প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরাই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। পরিদর্শনের ৬/৭ দিন পর ছাত্র-ছাত্রীরা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষককে রিপোর্ট উপস্থাপন করবে। প্রতিটি গ্রুপ হতে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক রিপোর্টের উপর আলোচনা করবেন। এতে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিতে পারবে। এর ফলে একটি গ্রুপ অন্য গ্রুপের রিপোর্টের উপর আলোচনার সুযোগ পাবে। এতে সামগ্রিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকতর লাভবান হবে।

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ফলপ্রসূ আলোচনায় বিবেচনাযোগ্য প্রশ্নাবলি

ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নপত্র

ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোক্তার কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন?
২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি আশ্রাপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে?
৩. উদ্যোক্তা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তিনি কীভাবে সেগুলো মোকাবিলা করেছেন।
৪. প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো কী রূপ?
৫. প্রতিষ্ঠানের কর্মী নির্বাচন, পদ্ধতি কী রূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপরে উল্লিখিত বিষয় আলোচনা করে বুঝতে পারবে ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কতটুকু সফল হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কী রূপ ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে?

ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা অর্জন করা এবং হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করা। ছাত্র-ছাত্রীরা যে রূপ ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে তা নিম্নরূপ:

১. ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যেন সুন্দর হয়।
২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেন বেশি দূরে না হয়।
৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের হলে ভালো হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে। এতে তারা তাদের প্রত্যাশিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

জ. প্রতিবেদন প্রণয়ন: পরিদর্শন শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের উপর সংগৃহীত তথ্যাবলির আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদনের নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ণ করবে। উক্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

ঝ. উপসংহার: বাস্তব শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে শিল্প স্থাপন, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, একজন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তার গুণাবলি পর্যবেক্ষণ, সাধারণ সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধান বের করা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান দান করে। মূলত এই লক্ষ্যেই ব্যবসায়ের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১০১৪

প্রশ্নমালা-৮

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পরিদর্শন কী?

২। পরিদর্শনের সাধারণ উদ্দেশ্য কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশাবলি আলোচনা করো।

২। ছাত্র ছাত্রীরা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে কী রূপ ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবে, উল্লেখ করো।

রচমামূলক প্রশ্ন

১। পরিদর্শনের সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশাবলি আলোচনা করো।

২। ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কর্মপ্রণালি আলোচনা করো।

৩। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রতিবেদন তৈরি করো।

১০১৪

নবম অধ্যায়
উৎপাদনশীলতার ধারণা
(Concept of Productivity)

উৎপাদনশীলতার ধারণা (Concept of Productivity)

যে কোন দেশের টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। বাংলাদেশে গত এক দশকে গড়ে ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং গত ২০২১ সালে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বে যে সকল দেশ এমডিজি (Millennium Development Goal) এর অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। সরকার এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনাও রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্ব ব্যাংকের মতে গত দশকে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৩ শতাংশ হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন উপকরণ দক্ষভাবে ব্যবহার করা গেলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশে এখনো অনেক কম। জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোস্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্যা প্যাসিফিক (ইউএনএসকাপ) ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বছরে আট হাজার মার্কিন ডলার। প্রতিবেদন অনুসারে এ অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে সিংগাপুর- যাদের শ্রম উৎপাদনশীলতা গড়ে একলক্ষ বত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার। শ্রমের উৎপাদনশীলতার দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলংকা ১৪, পাকিস্তান ২০ ও ভারত ২২তম স্থানে রয়েছে। দেশ তিনটির শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা যথাক্রমে ২০ হাজার, ১৮ হাজার ও ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। সে হিসেবে আমাদের দেশের শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে।

উৎপাদন (Production)

আমরা যদি আমাদের চারপাশের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই কৃষক মাঠে চাষ করছে, শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে, শিক্ষকগণ শ্রেণি কক্ষে পড়াচ্ছেন, শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করছে এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস-আদালতে অনেকেই কর্মরত। এভাবে সকলেই কোন না কোন দ্রব্য/পণ্য বা সেবা উৎপাদন করছে। এই দ্রব্য/পণ্য বা সেবার উপযোগ (Utility) সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় উৎপাদন (Production)। অর্থাৎ উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদনের বস্তুগত ও অবস্তুগত উপকরণের সমন্বয়ে কোনো পণ্য বা সেবার উপযোগ সৃষ্টি প্রক্রিয়া।

সাধারণভাবে মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ শুধু কোনো কিছুর রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উৎপাদন বলতে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায় । যেকোন বস্তুর অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করে যদি পণ্য বা সেবার উপযোগ সৃষ্টি করা যায় তবে তাকে উৎপাদন (Production) বলে। যেমন একটি গাছকে কেটে কাঠের তক্তা তৈরি করা হয় এবং তক্তা থেকে চেয়ার-টেবিল বা অন্যকোন আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। তখন ঐ গাছের উপযোগিতা সৃষ্টি করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগি আসবাব পত্রই হলো উৎপাদন। মাটির নীচে খনি হতে কয়লা উত্তোলন করে সে কয়লা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি উৎপন্ন করা হয়। মাটির নীচের কয়লাকে মানুষের ব্যবহার উপযোগি করে

জ্বালানি প্রস্তুত করাই এক ধরনের উৎপাদন। একজন কৃষককে কোন ফসল ফলাতে হলে জমি, বীজ, কীটনাশক, সার ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। শ্রমিক কারখানায় কাঁচামাল ও মেশিনসহ নানা উপকরণ ব্যবহার করে। অফিস-আদালতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে অনেক ধরনের সেবা প্রদান করা হয়।

উৎপাদনের উপকরণ:

- মূলধন (ভূমি, বিল্ডিং এবং অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, নগদ অর্থ);
- কাঁচামাল (সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের প্রযোজ্য কাঁচামাল);
- শ্রমিক (জন, শ্রমঘন্টা, সময়);
- জ্বালানি (তেল, বিদ্যুৎ, গ্যাস);
- অশিল্পজনিত ব্যয় (ষ্টেশনারি, প্রিন্টিং ব্যয়, ডাক, টেলিফোন, পানি ও বিজ্ঞাপন বিল, ব্যাংকিং চার্জ (ইত্যাদি)

উৎপাদনশীলতা (Productivity):

উৎপাদন আর উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সাধারণত যে হারে পণ্য বা সেবাসমূহ তৈরি করা হয় তাকে উৎপাদনশীলতা বলে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতির যোগান বা উপকরণ সমূহকে প্রয়োজনীয় উৎপাদনে পরিণত করার দক্ষতার একটি পরিমাপকে উৎপাদনশীলতা বলে। সে হিসাবে উৎপাদিত পণ্য/দ্রব্য বা সেবাই হলো উৎপাদন এবং সেই উৎপাদনের সাথে ব্যবহৃত উপকরণের অনুপাতই হলো উৎপাদনশীলতা (Productivity)। বিভিন্ন পণ্য ও সেবাদি উৎপাদনে সম্পদ, শ্রম, মূলধন, ভূমি, কাঁচামাল, শক্তি ইত্যাদি কার্যকর ব্যবহার হিসাবে উৎপাদনশীলতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উপকরণের পরিমাণ কমিয়ে বা অপচয় রোধ করে বা অধিকতর স্বল্প সময়ে গুণমান সম্পন্ন একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন বা সেবা যদি প্রদান করা যায় তবে সেক্ষেত্রে উক্ত উপকরণসমূহের যেটুকু সাশ্রয় ঘটবে তাই প্রকৃত উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন। নিম্নে ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা বিষয়টি আরও সহজে বুঝতে পারবো:

একজন পণ্য উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে (কাঁচামাল, শ্রমিক, জ্বালানি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি) একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১০০০ ইউনিট দ্রব্য তৈরি করেন। একই প্রস্তুতকারী যদি পরবর্তী সময়ে দ্বিগুণ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে মোট ২০০০ ইউনিট দ্রব্য তৈরি করেন সেক্ষেত্রে, মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি। বিনিয়োগকারী যদি তার বিনিয়োগ সমহারে না বাড়িয়ে উপকরণসমূহের কোন এক বা একাধিকটির পরিমাণ কমিয়ে এবং উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার করে মানসম্মত একই পরিমাণ বা পূর্বের চেয়ে অধিকহারে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন তবে তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হবে। অধিক উৎপাদন, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, অপচয় রোধ, সময়মত পণ্য/দ্রব্য বা সেবা প্রদান করা, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ইত্যাদি নিশ্চিত করা উৎপাদনশীলতার উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জনের দৃষ্টিতে উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

গাণিতিকভাবে, উৎপাদনশীলতা হলো উৎপাদন (Output) ও উপকরণ (Input) এ দু'য়ের অনুপাত অর্থাৎ

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদন}}{\text{উপকরণ (মূলধন, কাঁচামাল, শ্রমিক, জ্বালানি)}}$$

২০২৪

এ ছাড়াও গতকালের চেয়ে আজকে ভালো এবং আজকের চেয়ে আগামী দিন আরও ভালো যাবে এ ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকা ও সে অনুযায়ী কাজ করা, সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, প্রতিনিয়ত উন্নত মনের মনোভাব প্রকাশ, গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিছু ভাল মানের কাজ করাই উৎপাদনশীলতা।

উদাহরণ ০১:

১ একর জমিতে ৫ কেজি বীজ, ৫ বস্তা সার এবং ২ জন কৃষক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করে ৪ মাস পর ২ টন ধান উৎপাদন করল। তাহলে এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হবে-

উৎপাদনশীলতা(Productivity)=

উৎপাদন (২ টন ধান)

উপকরণ (১একর জমি, ৫কেজি বীজ, ৫বস্তা সার এবং ২জন কৃষকের ৪মাসব্যাপী ৮ঘন্টা দৈনিক শ্রম)

ধরি, এখানে,

২ টন ধানের মূল্য	৩৩০০০ টাকা
১ একর জমির লিজের মূল্য	৪০০০ টাকা
বীজের মূল্য	২০০ টাকা
সারের মূল্য	১৫০০ টাকা
শ্রমিকের মূল্য	১২০০০ টাকা

উৎপাদন (২ টন ধানের মূল্য ৩৩০০০ টাকা)

= ---

উপকরণ (জমির লিজের মূল্য ৪০০০ টাকা, বীজের মূল্য ২০০, সারের মূল্য ১৫০০, শ্রমিকের মজুরী ১২০০০) টাকা

উৎপাদন (Output)

এ থেকে আমরা সহজে বলতে পারি উৎপাদনশীলতা = ----------------------------- = ১.৮৬

উপকরণ (Input)

উপরের উদাহরণ হতে দেখা যায় যে, উৎপাদিত ফসল ধান এবং ধান চাষে ব্যবহৃত উপকরণ যেমন- জমি, বীজ, সার, কৃষকের শ্রম ইত্যাদি। মূলত উৎপাদন হলো উৎপাদনশীলতার একটি অংশ মাত্র। এখানে উৎপাদিত ধানের মূল্য ৩৩০০০ টাকা এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের মোট মূল্য ১৭,৭০০ টাকা। উৎপাদন ও উপকরণের অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা ১.৮৬।

উদাহরণ ০২:

একজন গৃহিনী তার বাসার রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য বায়োগ্যাস পদ্ধতির চূলা ব্যবহার করেন। এতে তার বাড়ির পাশে মাত্র ১ শতাংশ জমি, ২টি গরুর গোবর, অপ্রয়োজনীয় ময়লা আবর্জনা ও পানি ব্যবহার করে দৈনিক ১ ঘন্টা শ্রম দিয়ে প্রায় ১ ঘনফুট বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে রান্নার কাজ সম্পন্ন করেন। তাহলে এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হবে-

উৎপাদনশীলতা(Productivity)=

উৎপাদন (১ ঘনফুট বায়োগ্যাস)

উপকরণ (১শতাংশ জমি, ২টি গরুর গোবর, ময়লা-আবর্জনা ও পানি, ১জন গৃহিনীর দৈনিক ১ঘন্টা শ্রম)

ধরি, এখানে,

১ ঘনফুট বায়োগ্যাসের উৎপাদন মূল্য	২০০০ টাকা
জমি লিজের মূল্য	৮০০ টাকা
গোবরের মূল্য	২০০ টাকা
ময়লা-আবর্জনার মূল্য	১০০ টাকা
গৃহিনীর মজুরী	১০০ টাকা

উৎপাদন (১ ঘনফুট বায়োগ্যাসের মূল্য ২০০০) টাকা

=---

উপকরণ (জমি লিজের মূল্য ৮০০ টাকা, গোবরের মূল্য ২০০, ময়লা-আবর্জনার মূল্য ১০০, গৃহিনীর মজুরী ১০০) টাকা

২০০০ টাকা

= ----------------------- = ১.৬৭

১২০০ টাকা

উৎপাদন (Output)

এ থেকে আমরা সহজে বলতে পারি উৎপাদনশীলতা = -------------------------- = ১.৬৭

উপকরণ (Input)

উপরের উদাহরণ হতে দেখা যায় যে, ১ ঘনফুট বায়োগ্যাস হলো উৎপাদন যার মূল্য ২০০০ টাকা এবং বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ যেমন- জমি, গোবর, ময়লা-আবর্জনা, মজুরী ইত্যাদির মোট মূল্য ১২০০ টাকা। উৎপাদন ও উপকরণের অনুপাত অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা ১.৬৭।

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক:

অনেকেই মনে করেন, উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা একই বিষয় এবং এদুটির মধ্যে সবসময় ধনাত্বক সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং উৎপাদন কমলে উৎপাদনশীলতাও কমবে। আসলে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি নির্ভর করে উৎপাদন ও উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ এ দুয়ের অনুপাতের উপর। অর্থাৎ উৎপাদন যে হারে বাড়বে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তাহলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। আবার উৎপাদন যে হারে বাড়ে উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় যদি তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে তাহলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, উৎপাদন স্থির থাকা অবস্থায় যদি ১০১৪

উপকরণ বা উপকরণজনিত ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনশীলতাও বাড়বে কথাটি পুরোপরি সত্য নয়, বরং উৎপাদনশীলতা বাড়লে উৎপাদন বাড়তে পারে। নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:
মনেকরি, একটি প্রতিষ্ঠানে ১০,০০০ ইউনিট উৎপাদন করতে ৫০ জন শ্রমিকের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে ২৫ দিন সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা হচ্ছে নিম্নরূপ:

$$\text{উৎপাদনশীলতা (শ্রম)} = \frac{\text{১০,০০০ ইউনিট}}{৫০ \times ৮ \times ২৫} = \text{১ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা।}$$

মনেকরি, ঐ একই প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন শ্রমিকের স্থলে ৬০ জন শ্রমিক নিয়োগ করার পর ৬০ জন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা করে ২৫ দিনে ১২,০০০ ইউনিট উৎপাদন করল। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই প্রতিষ্ঠান ৫০ জন শ্রমিকের স্থলে ৬০জন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০০০ ইউনিট বেশি উৎপাদন করেছে।

$$\text{উৎপাদনশীলতা (শ্রম)} = \frac{\text{১২,০০০ ইউনিট}}{৬০ \times ৮ \times ২৫} = \text{১ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা।}$$

উপরের উদাহরণ হতে আমরা বলতে পারি যে, এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়নি, উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ১। উৎপাদন বেড়ে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ ইউনিট হয়েছে এবং ৫০ জন শ্রমিকের স্থলে ৬০ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উৎপাদন ও উপকরণ সমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়েনি। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় উৎপাদন বাড়লেই উৎপাদনশীলতা বাড়ে না।

আবার মনেকরি, ঐ একই প্রতিষ্ঠানে ১০,০০০ ইউনিট উৎপাদন করতে ৫০ জন শ্রমিকের স্থলে ৪০ জন দক্ষ শ্রমিককে ব্যবহার করে। এতে প্রতিদিন ৮ঘণ্টা করে ২৫দিন সময় লাগে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনশীলতা হচ্ছে নিম্নরূপ:

$$\text{উৎপাদনশীলতা (শ্রম)} = \frac{\text{১০,০০০ ইউনিট}}{৪০ \times ৮ \times ২৫} = \text{১.২৫ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা।}$$

(উৎপাদনশীলতা ০.২৫ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে)

ঐ প্রতিষ্ঠানটির ১২,০০০ ইউনিট উৎপাদন করতে ৫০ জন শ্রমিকের প্রতিদিন ৮ঘণ্টা করে ২৫দিন সময় লাগে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা হচ্ছে নিম্নরূপ:

$$\text{উৎপাদনশীলতা (শ্রম)} = \frac{\text{১২,০০০ ইউনিট}}{৫০ \times ৮ \times ২৫} = \text{১.২০ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা।}$$

২০২৪ (উৎপাদনশীলতা ০.২০ ইউনিট/শ্রম ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে)

উপরের উদাহরণ হতে আমরা দেখতে পাই, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের চেয়ে শ্রমিক দক্ষ হওয়ায় কম সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে সমপরিমান উৎপাদন (১০,০০০ ইউনিট) এবং সমসংখ্যক শ্রমিক দিয়ে বেশি পরিমান উৎপাদন (১২,০০০ ইউনিট) করা সম্ভব হয়েছে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, উপকরণের (শ্রমিক) দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

উৎপাদনশীলতা সুফল: বর্ধিত উৎপাদনশীলতার সুফল কে নিম্নের চার্টের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারি:

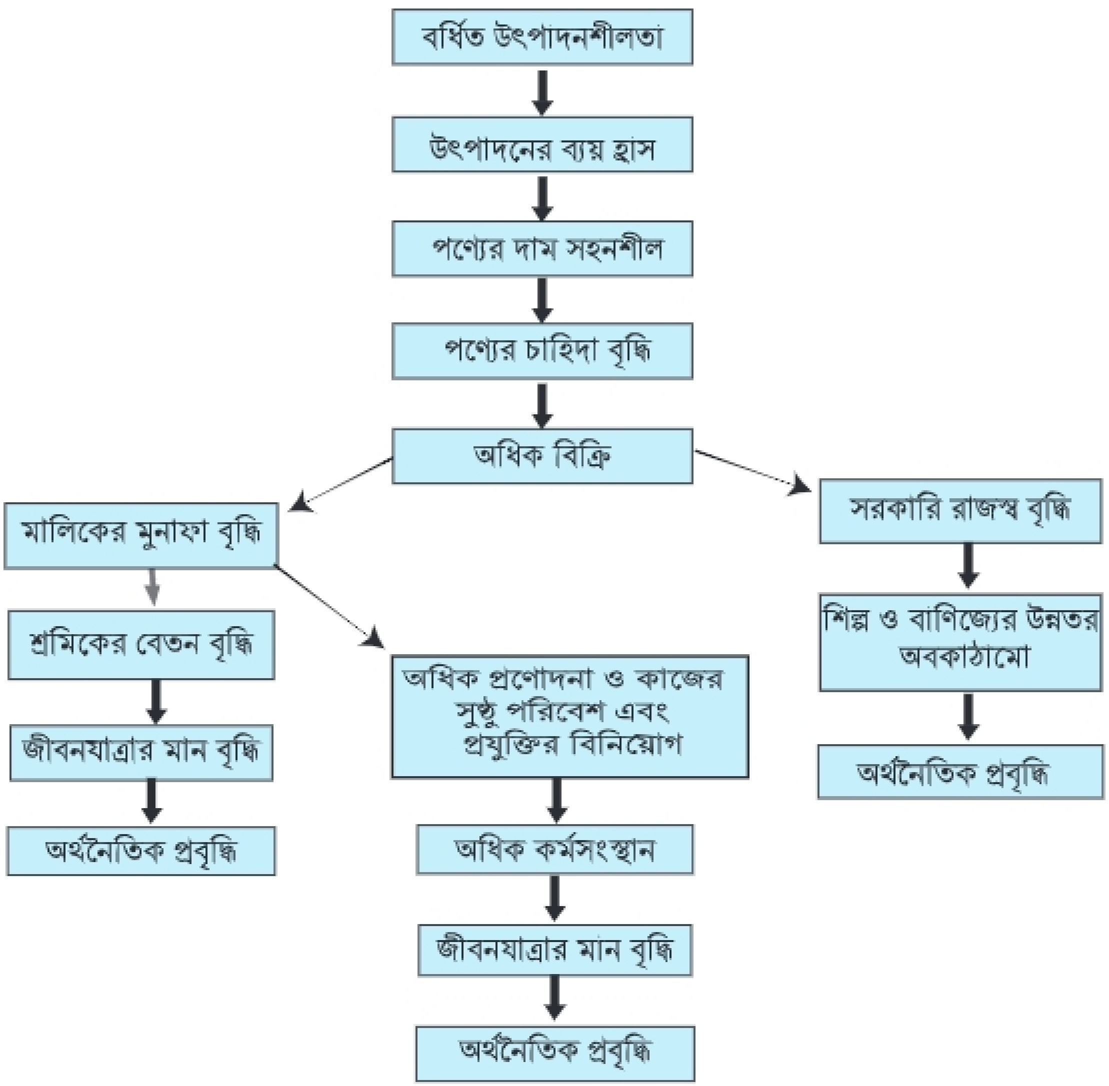

নিম্নোক্ত উপায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, যেমন:

১. স্মার্টলি কাজ করা: শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে, কাজের প্রতি আন্তরিক এবং সচেতন হলে অর্থাৎ স্মার্টলি কাজ করলে উপকরণ (ইনপুট) ঠিক রেখে উৎপাদন (আউটপুট) বাড়ানো যায়। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি}\uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)}\uparrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}\rightarrow}$$

২. অপচয়রোধ করা : অপচয়রোধের মাধ্যমে পূর্বের উৎপাদন (আউটপুট) ঠিক রেখে উপকরণ (ইনপুট) ব্যয় কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি}\uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)}\rightarrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}\downarrow}$$

৩. কাজের সমন্বয় করে: কাজের সমন্বয়ের মাধ্যমে উপকরণ (ইনপুট) ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন (আউটপুট) অধিক বৃদ্ধি করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি}\uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)}\uparrow\uparrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}\uparrow}$$

৪. ব্যয় কমিয়ে : উৎপাদন (আউটপুট) তুলনায় উপকরণ (ইনপুট) ব্যয় অধিক কমিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি}\uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)}\downarrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}\downarrow\downarrow}$$

৫. আদর্শ পরিকল্পনা : কাজের প্রতিটি স্তরে যথাসম্ভব উপকরণ (ইনপুট) কমিয়ে উৎপাদন (আউটপুট) বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

$$\text{উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি}\uparrow = \frac{\text{উৎপাদন (আউটপুট)}\uparrow}{\text{উপকরণ (ইনপুট)}\downarrow}$$

উৎপাদনশীলতা বা Productivity উন্নয়নের কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার জন্য এনপিও (National Productivity Organization) এর উদ্যোগে গত ২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক "Multilateral Conference on Productivity Movement in Bangladesh: Strategy for ২০২১" শীর্ষক একটি বহুমুখী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উৎপাদনশীলতার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করেন। প্রতি বছর ২ অক্টোবরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস এবং প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদানের ঘোষণা দেন। সে অনুযায়ী প্রতি বছর ২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন এবং কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতকে উৎসাহিত করার জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড প্রদান করা হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য এ ঐতিহাসিক ঘোষণা উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরো বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছে।

সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার তথা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আমরা সহজে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করতে পারি। প্রত্যেকে যার যার কাজে মনোযোগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে, অপচয় কমিয়ে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নই হতে পারে বাংলাদেশের উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি।

প্রশ্নমালা-৯

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উৎপাদন এর সংজ্ঞা দাও ?

২. উৎপাদনের উপকরণগুলি কি কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. উৎপাদনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা কর?

২. উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপায় সমূহ বর্ণনা কর।

২. "উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্ভব" তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাপ্ত

স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমস-এ বাংলাদেশ

২০১৯ সালে আবুধাবিতে স্পেশাল অলিম্পিকস ওয়ার্ল্ড গেমসে বাংলাদেশের ১৩৯ সদস্যের দল অংশগ্রহণ করে। গেমসে ২২টি সোনা, ১০টি রুপা এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে লাল-সবুজেরা। ২০১৫ সালে লস এঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত এই গেমসে ১৮টি সোনা, ২২টি রুপা ও ১৮টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি প্রতিবারই স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে সাফল্য অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন এবং গণভবনে নিজেই তাদের সংবর্ধিত করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলও অটিজম নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এমন উৎসাহ ভবিষ্যতের স্পেশাল অলিম্পিকস ওর্য়ান্ডি গেমসে বাংলাদেশকে আরও বিশাল বিজয়ের পথে এগিয়ে নিবে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসায় উদ্যোগ

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য